স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ
হাওড়া-৭১১ ২০২

প্রকাশক ঃ
স্বামী বন্দনানন্দ
রামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১ ২০২

৭ই মে, ২০০৫
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য ঃ ৫ টাকা

মুদ্রক ঃ
সৌমেন ট্রেডার্স সিণ্ডিকেট
৯/৩, কে. পি. কুমার স্ট্রীট
বালি, হাওড়া-৭১১ ২০১

স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ (১৯০৮—২০০৫)

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

একটি বার তের বছরের নিতান্ত বালক একদিন তার মায়ের সামনে তার এক বন্ধুকে কিছু খারাপ কথা বলে। মা তক্ষুনি সস্নেহ ধমকের সুরে তাকে বলেছিলেন, "বাবা, তোমার জিহ্বাতে সরস্বতী বা বাণীর অধিষ্ঠান। অপরকে খারাপ কথা বলে সে স্থান অপবিত্র করো না। সরস্বতী যে বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবী ; সে স্থানকে অপবিত্র করা মানে দেবী সরস্বতীকে অবমাননা করা।" সেই বালক পরবর্তী কালে জীবনসায়াহ্নে উপনীত হয়ে বলেছিলেন, "সেদিনের সে উপদেশ সরাসরি আমার মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল এবং গত সাত-আট দশক ধরে তা আমাকে প্রভাবিত করে রেখেছে।"

সেদিনের সেই বালক আর কেউ নন, পরবর্তী কালের স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রয়োদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ। জীবনের অঙ্কুরোদ্‌গমের মুখে তাঁর মা যেভাবে ছোট্ট বীজটির মধ্যে বিশাল মহীরূহ হয়ে ওঠার দিক্‌নির্দেশ করেছিলেন, তা তাঁর জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল প্রায় ঠিক সেই ভাবেই। যথার্থই স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর জিহ্বাতে ছিল সরস্বতী বা বাণীর অধিষ্ঠান। সে বলেই বলীয়ান হয়ে তিনি যেন ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক দূত হিসেবে সমগ্র পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বারবার ছুটে বেড়িয়েছেন এদেশের সনাতন আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির প্রচারক এবং আধুনিক জীবনের প্রেক্ষাপটে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সুমহান বাণীর বার্তাবহ হয়ে। সে কাজে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং অত্যুচ্চ সম্মানের বিরল অধিকারী।

কেরল প্রদেশের ছোট্ট গ্রাম ত্রিক্কুর। ত্রিশূর শহর থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দূর। সেই গ্রামের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে একটি নদী, নাম মানালী। সেই গ্রামেই ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মতিথিতে জন্মগ্রহণ করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী। পূর্বাশ্রমের নাম শঙ্করণ মেনন। ডাকনাম কোচাপ্পান। বাবার নাম নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী। একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত। মায়ের নাম লক্ষ্মীকুট্টী আম্মা। মধ্যবিত্ত লম্বোদরী পরিবার। মা-বাবার দশটি সন্তানের মধ্যে শঙ্করণ সপ্তম। উপরে ছয় ভাই ; পরে ছোট একটি ভাই ও দু-বোন। শঙ্করণের জন্ম সম্বন্ধে বেশ মজার কাহিনী আছে। ছয়টি পুত্র সন্তানের পর মা-বাবার বড় সাধ একটি কন্যা সন্তানের। সে সময় তাঁরা বেড়াতে গেছেন ব্যাঙ্গালোর। কাছেই শঙ্কর মঠ। নিত্য সেখানে গিয়ে দেবতার কাছে পূজা দেন। কাতর প্রার্থনা জানান মনোবাসনা পূরণের। ক্রমে মা গর্ভবতী হন এবং আশ্চর্য ব্যাপার—আবার জন্ম দেন এক পুত্র সন্তানের। মা-বাবার বিশ্বাস, ভগবান শঙ্করের ইচ্ছায় এবার তাঁদের পুত্র লাভ। অতএব পুত্রের নাম রাখেন শঙ্করণ।

অতি শৈশবেই শঙ্করণ বাবার কোলে বসে পুরাণের কাহিনী মনোযোগ দিয়ে শুনত। রামায়ণ-মহাভারতের অনেক ঘটনা শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী কালে ছোট বোন সারদাম্বাল জানিয়েছেন যে, ছেলেবেলায় যখন খেলুড়ে সাথীরা ঝগড়া-বিবাদ করত, তখন শঙ্করণ ধ্যানে বসে যেত এবং ধ্যান থেকে উঠেই ঝগড়া মিটিয়ে দিত। সকলে তার

মীমাংসা মেনে নিত। আবার কখনো কখনো বোনকে কাছে বসিয়ে দেবদেবীর স্তোত্র ও অনেক গল্প শোনাত। তাদের বাড়ীর পূব দিকে আধমাইল দূরে একটি উঁচু টিলার উপর ছিল পাথরের তৈরী একটি শিব মন্দির। ১৫০টি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হত সে মন্দিরে। সেখানে উঠানামা ছিল তাদের এক খেলা এবং তারই মাঝে শিবপূজোয় বসা ছিল শঙ্করণের অপর একটি প্রিয় সখ। তাদের বাড়ীর কাছে নদীর তীরে ছিল এক দেবী-মন্দির। মায়ের সঙ্গে সেও সেখানে যেত। মায়ের জন্য ফুল, বেলপাতা তুলে নেওয়া ছিল তারই কাজ।

যাহোক, পরবর্তী কালে মহারাজ নিজের জীবনের কিছু কথা বলতে গিয়ে স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন ঃ

"যদিও বলা যায় যে অধিকাংশ স্বপ্ন শুধুই স্বপ্ন, তথাপি কতকগুলি স্বপ্ন কারো জীবন ও অদৃষ্টে ভাবী উন্নতির সূচনা ব্যক্ত করে। মধ্য কেরল প্রদেশে নদীতীরস্থ আমার জন্মস্থান ত্রিক্কুর গ্রামের উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত মনোরম গুহামন্দিরে শিবের পূজায় আমি অনুরাগী ছিলাম ছোটবেলা থেকেই। ন-দশ বছর বয়সে আমি একটি স্পষ্ট স্বপ্ন দেখি, আমার অনুভব হল আমি যেন সংসার কোলাহলের বাহিরে আকাশ মার্গে বাহিত হয়ে পবিত্রতা ও শান্তির আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠে যোগাসনে উপবিষ্ট এক বর্ষীয়ান ঋষির সান্নিধ্যে উপনীত হয়েছি। দর্শন মাত্রই আমার হৃদয় সত্যই ঋষিকে চিনতে পারল। তাঁর বামপাশে আসন গ্রহণ করবার জন্য ঋষি আমাকে প্রেমভরে ইঙ্গিত করলেন। ঋষির ইঙ্গিত শিরোধার্য করলাম। তারপর ঋষি আমাকে কিছু ধর্মোপদেশ দেন। আমি আনন্দে আত্মহারা হলাম। সেই পরমানন্দের ভাবেই স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হই।"

ত্রিক্কুর থেকে ত্রিশূর যাবার পথে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ওল্লুর। ওখানের এক হাইস্কুলে ভর্তি হল শঙ্করণ। সবকিছুতেই তার অদম্য উৎসাহ আর প্রাণোচ্ছলতা। ফুটবল সবচেয়ে প্রিয়। সেসময় থেকেই অ্যাডভেঞ্চারাস। নৌকা বাইতে পছন্দ। স্রোতের বিপরীতে চলে যেত অনেক দূর।

এ সময়ে একবার তার মায়ের অসুখ হ'ল। উদ্দাম জলস্রোতে নৌকা চালিয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করে ওষুধ নিয়ে এল। পরে মহারাজ বলেছিলেন, "সেই থেকে এই অ্যাডভেঞ্চার-প্রীতি এবং সেই সঙ্গে সহজ জীবনের প্রতি একটা অনীহা এবং জার্মান দার্শনিক নিৎসে যেমন বলেছেন, 'বাঁচো বিপজ্জনকভাবে'—এই ভাব আমার চির সঙ্গী হয়ে রইল।"

শঙ্করণের বয়স তখন প্রায় পনেরো। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। একদিন তার এক বন্ধু ত্রিশূর টাউন লাইব্রেরী থেকে একটি ইংরেজী বই এনে তাকে জিজ্ঞাসা করল, "একটা বই পড়বে?" সে বলল, "হ্যাঁ পড়ব।" বন্ধুটি শঙ্করণকে বইটি দিয়ে চলে গেল। বইটি ছিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-র ইংরাজী অনুবাদ। বইটি পড়তে আরম্ভ করেই সে তাতে একেবারে এত নিমগ্ন হয়ে গেল যে, একটানা একশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত না পড়ে থামতে পারল না। তৎক্ষণাৎ তার হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব এসে পড়ল প্রচণ্ডভাবে। সেই শুরু এবং সেই প্রভাব তার জীবনে গভীরতা ও ব্যাপ্তি পেতে আরম্ভ করল। একে একে শঙ্করণ পড়ে ফেলে সাতখণ্ডে স্বামীজীর বাণী ও রচনা (Complete Works of Swami Vivekananda), দুখণ্ডে 'Gospel

of Sri Ramakrishna', ভগিনী নিবেদিতার 'The Master as I Saw Him' এবং সেই সঙ্গে মুখস্থ করে ফেলল শ্রীমা সারদাদেবীর উদ্দেশে বিরচিত স্বামী অভেদানন্দের অনবদ্য স্তোত্র 'প্রকৃতিং পরমাম্'। এ সবের দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল শঙ্করণের ভবিষ্যৎ জীবনের রূপরেখা—যার মধ্যে ছিল ঈশ্বরকে ভালবাসা এবং সেই সঙ্গে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে মানুষকে ভালবাসা।

সেটা ১৯২৪ সাল। শঙ্করণের বয়স প্রায় ষোল। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদানের সুযোগের অপেক্ষায়। ১৯২৬ সালে বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা হওয়ার পর একদিন মাদ্রাজ মঠে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে চিঠি পাঠায় শঙ্করণ। জবাবে এক ব্রহ্মচারী লেখে, "এখানে জায়গা কম। মহীশূরে একটি নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সেখানে ব্রহ্মচারী দরকার। সুতরাং তুমি সেখানকার অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীকে জানাও।" যথারীতি সিদ্ধেশ্বরানন্দজীকে চিঠি লেখে শঙ্করণ। ইতিমধ্যে সিদ্ধেশ্বরানন্দজী (গোপাল মহারাজ) চলে এসেছেন ত্রিশূরে। সেখানে তাঁর সঙ্গে সঙ্ঘে যোগদানের বিষয়ে কথাবার্তা হয়। একদিন সন্ধ্যায় শঙ্করণ সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে তাঁরা উটি শহরে এসে পৌঁছান। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী শিবানন্দজীর সাথে সাক্ষাৎ। স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী শঙ্করণকে মহাপুরুষজীর কাছে নিয়ে গেলেন। সে মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল এবং শ্রীরামকৃষ্ণের একজন পার্ষদের পূত সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করে নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করল। উটিতে তাঁরা এক সপ্তাহ ছিলেন। উটিতে থাকাকালীন পঞ্চম দিবসে (৩০শে জুন ১৯২৬) মহাপুরুষজীর কাছ থেকে তার মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের সব বন্দোবস্ত করলেন স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী।

পরবর্তী ঘটনা মহারাজের নিজের ভাষায়ঃ "মহাপুরুষজী একটি প্রকোষ্ঠে একখানা কার্পেটে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি সেখানে প্রবেশ করে মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম। তিনি তাঁর বাম পার্শ্বে একখানা আসনে বসতে আমাকে ইঙ্গিত করলেন। আসনে বসে মহাপুরুষজীর নিকট আধ্যাত্মিক উপদেশ গ্রহণ করার সময় আমার বাল্যকালীন একটি স্মৃতি অতি আশ্চর্যরূপে হুবহু মনে জাগল। আমি দেখলাম, আমার সেই বাল্যকালের স্বপ্নটি বাস্তব জগতে পুনরভিনীত হচ্ছে—আমি একটা পাহাড়ে উঠছি। সেখান থেকে এক সৌম্যমূর্তি বর্ষীয়ান পুরুষের বেশধারী শিবের সান্নিধ্যে উপনীত হয়ে তাঁর বামপার্শ্বে উপবেশন করেছি। এসব দেখে আমার হৃদয় পরমানন্দে ভরপুর হল। মন্ত্রদীক্ষার পর মহাপুরুষজী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গুরুদক্ষিণা দেবার কিছু এনেছ?' আমি বললাম, না, মহারাজ। তখন তিনি আমার হাতে ২/৩টি আম দিলেন এবং বললেন, 'দক্ষিণাস্বরূপ আমগুলি আমাকে দাও।' আমি তা-ই করলাম। দীক্ষার পর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

"ঠিক হলো ২রা জুলাই আমরা মহীশূরে চলে যাব। সিদ্ধেশ্বরানন্দজী ও আমি মহারাজের কাছে বিদায় নিতে গেলাম। আমি মহারাজকে প্রণাম করতে তিনি বললেন, 'বেশ, তুমি মহীশূর যাচ্ছ ; সেখানে গোপালের সেবা করো।' উটি থেকে সকাল সাতটার বাসে আমাদের যাত্রা শুরু হল। মহীশূর আশ্রমে যখন পৌঁছলাম তখন রাত নটা।

"মহীশূরে যে দিন পৌঁছাই, সেদিন ২রা জুলাই, ১৯২৬। পরদিন আমার চুল ছাঁটা হয়ে গেল। ৪ঠা জুলাই থেকে আশ্রমের রান্না ঘরে আমি কাজ আরম্ভ করলাম। আশ্রমে তখন কোন মাইনে করা রাঁধুনি ছিল না, কারণ আশ্রমের আয় ছিল যৎসামান্য। খাবার নিম্নমানের। এসব খেয়েই সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। আমি ছিলাম এক জন দক্ষ পাচক। বার বছর বয়সে রান্নায় আমার হাতেখড়ি। বার থেকে চৌদ্দ—এই দুবছর একটানা আমাকে বাড়ীতে গোটা পরিবারের জন্য রান্না করতে হয়েছিল। সুতরাং আশ্রমে রান্নার ভার হাতে নেওয়ার পর সবাই মোটামুটি ভাল খাবার পেতে আরম্ভ করলেন। তখন থেকে ক্রমান্বয়ে ছয় বছর মহীশূর আশ্রমে সেই কাজেই আমি বহাল থাকলাম। সেই সঙ্গে বাসন মাজা ও আশ্রম রক্ষণাবেক্ষণের কাজও করতে হত। মাসিক চাঁদা আদায়, বাগানে গাছের পরিচর্যা এবং অন্যান্য কাজও পরবর্তী কালে করেছি । চাঁদা সংগ্রহের অবকাশে যখনই লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলতে হয়েছে তখন স্বামীজীর প্রসঙ্গই তাঁদের সাথে করতাম। খুশী হয়ে তাঁরা শুধু টাকাই দিতেন না, ইডলি ইত্যাদিও খাওয়াতেন। শুধু তা-ই নয়, আশ্রমে নিয়ে যাওয়ার জন্য সঙ্গেও কিছু দিতেন। আশ্রম জীবনের প্রথম পর্যায়ে আমার এভাবেই কেটেছে—একদিকে কর্মমুখর জীবন, অন্যদিকে কাজের ফাঁকে গভীর পড়াশুনা। কাজের চাপ প্রচুর পরিমাণে থাকলেও আমি কিন্তু জীবনে কোনদিন পড়াশুনা বা জপধ্যানের সময় পাচ্ছি না বলে অভিযোগ জানাইনি। মন থাকত প্রফুল্ল এবং সব ধরণের কাজই ঠাকুরের সেবা জ্ঞানে করতাম ও তাতে আনন্দ পেতাম। শরীর-মনে কোন ক্লান্তি ছিল না। আশ্রমের আখড়ায় ছাত্রদের সঙ্গে কুস্তি লড়তাম ; পরবর্তী কালে তাদের সাথে ভলিবল বা বেসবলও খেলেছি।

"দেখতে দেখতে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ এসে গেল। বছরটি আমার জীবনে স্মরণীয়। সে বছরই আমি ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হই। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন আমার ব্রহ্মচর্য দীক্ষা হয়। মহাপুরুষ মহারাজ আমার নতুন নাম দিলেন—ব্রহ্মচারী যতিচৈতন্য। ঐ উপলক্ষে একটানা চার মাস আনন্দে মঠবাস করি। তারপর মহীশূরে ফিরে গেলাম।

"দেখতে দেখতে কেটে গেল আরও চারটি বছর। উপস্থিত হল ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। বেলুড় মঠে এলাম সন্ন্যাস নিতে। সে বছর ২৩শে জানুয়ারী স্বামীজীর জন্মতিথিতে আমাদের সন্ন্যাস দীক্ষা হয়। সন্ন্যাসের মুহূর্তটি ছিল আমার জীবনে অত্যন্ত আনন্দময়। তবে ঐ সময়ে মহাপুরুষ মহারাজের শরীর ছিল বেশ দুর্বল। সেজন্য পুরানো মন্দিরের পিছনের ঘরে যেখানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি নিজের ঘরেই ছিলেন। বিরজাহোমের পর আমরা নয় জন তাঁর ঘরে যাই। তিনি আমাদের গৈরিকবস্ত্র ইত্যাদি দেন এবং আশ্রমোচিত নতুন নামও আমরা তাঁর কাছ থেকে পাই।"

নিজ গুরুর কাছে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস প্রাপ্তির পর স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর ইচ্ছে হল ঠাকুরের অন্যান্য কয়েকজন সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী পার্ষদের পুণ্য দর্শন ও সঙ্গলাভ করার। সে সবের বিবরণ তাঁর নিজের স্মৃতি কথায় ঃ "সন্ন্যাস নিতে এসে এবারেও চার মাস মঠে কাটিয়ে যাই। স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' পাঠ করার সুবাদে ঐ সময়ে আমার মনে একটা আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। স্বামীজী, গুরুভাই অখণ্ডানন্দজীর প্রতি যে উচ্চাশা পোষণ

করতেন সেটি তাঁর বই পড়ে জানতে পেরেছিলাম। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি স্বামীজীর সেবাধর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গরীব ও পিছিয়ে পড়া মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। গঙ্গাধর মহারাজের (স্বামী অখণ্ডানন্দ) প্রশংসা করতে গিয়ে স্বামীজী অনেকবার বলেছেন ঃ 'গঙ্গা, তুই আমার প্রত্যাশিত ব্যক্তি'। অখণ্ডানন্দজী তখন সারগাছিতে। আমিও এদিকে এসেছি। তাই ইচ্ছা হল তাঁকে দেখে আসি। মহাপুরুষ মহারাজের কাছ থেকে সারগাছি যাওয়ার অনুমতি নিলাম। তখনকার দিনে সপ্তাহান্তে ঘোরার টিকিট খুব সস্তায় পাওয়া যেত। আমিও এভাবে একদিন সারগাছিতে উপস্থিত হলাম। আশ্রমে গিয়ে অখণ্ডানন্দজীকে প্রণাম করলাম এবং কি ইচ্ছা নিয়ে এসেছি তা-ও তাঁকে বললাম। সারগাছিতে আমি নবাগত ; বয়সেও নবীন। বড়জোর চব্বিশ-পঁচিশ বছর হবে। কিন্তু মহারাজ আমার এমন সমাদর আরম্ভ করলেন যে, আমি যেন এক অতি সম্মানিত অতিথি! আমার জন্য সুন্দর কাপ-প্লেট, বিশেষ ধরণের কেট্‌লি ইত্যাদি সব ব্যবস্থা করে দিলেন। আমাকে লক্ষ্য করে মহারাজ আশ্রমের ছাত্রদের বলেতেন, 'যাও মহারাজকে প্রণাম করে এসো।' আমি প্রতিবাদের সুরে বলতাম, মহারাজ একি বলছেন। আপনার সামনে আমাকে প্রণাম? আমার আপত্তি অগ্রাহ্য করে বলতেন, 'আরে তুমি মহীশূর থেকে এসেছ!' ছাত্রদের তিনি নির্দেশ দিতেন—'প্রণাম কর।' সব বিদ্যার্থী এসে প্রণাম করত।

"এভাবে কেটে গেল দুদিন। যাওয়ার সময় এগিয়ে এল। আমি মহারাজকে অনুরোধ করলাম, মহারাজ, আপনি এই ঝোপ জঙ্গলে বাস করছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তান আপনি। কত ভক্ত আপনাকে দর্শন করবার ইচ্ছায় মঠে আসেন। আপনি মঠে থাকলে খুব ভাল হত। মহারাজ আপনি মঠে চলে আসুন। তাহলে আমরা আপনার সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পাব। এরপর মহারাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রেলস্টেশনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। আমি অখণ্ডানন্দজীর ঘরে ঢুকে প্রণাম করে বললাম, আমি বিভিন্ন ধরণের মানুষ, বিশেষতঃ যুবকদের মধ্যে কাজ করছি। আশীর্বাদ করুন যাতে স্বামীজীর যন্ত্রস্বরূপ হয়ে যুবকদের তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে পারি। আমি নিশ্চিত যে আপনার আশীর্বাদ থাকলে এই কাজে আমি সফল হব। আমি স্বামীজীকে দেখিনি। আপনাকে দর্শন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। স্বামীজী আপনাকে কত ভালবাসতেন। আমার কাছে আপনার আশীর্বাদ স্বামীজীরই আশীর্বাদ। একথা শোনামাত্র মহারাজের সেই শিশুসুলভ চপলতা যেন কোথায় হারিয়ে গেল। মুখে তাঁর গাম্ভীর্য ফুটে উঠল। মহারাজ আমার মাথায় দু-হাত রেখে দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আমি আশীর্বাদ করছি, আমি আশীর্বাদ করছি।' তাঁর এই স্পর্শে এক উচ্চভাবে আমার অন্তর ভরে গেল। বোধ করলাম, যেন কোন এক শক্তি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করছে। এরপর আর কোন বাক্য বিনিময় হল না। আমি প্রণাম করে নিঃশব্দে অখণ্ডানন্দজীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে স্টেশনের পথে পা বাড়ালাম। মহারাজ বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্টেশনের দিকে তাকিয়ে রইলেন যতক্ষণ আমি তাঁর দৃষ্টির বাইরে চলে না যাই।

"কলকাতায় পৌঁছে অদ্বৈত আশ্রম ঘুরে বেলুড় মঠে এলাম। এসে দেখি, অখণ্ডানন্দজী তার আগেই মঠে পৌঁছে গেছেন। এর কারণ, মহাপুরুষ মহারাজ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের দরুণ অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন। যাইহোক, ক্রমে আমার মহীশূরে ফিরে যাওয়ার

সময় হয়ে এল। অখণ্ডানন্দজীর কাছে বিদায় নিতে গেলে তিনি বললেন, 'আমি মাঝে মাঝে বাতের ব্যথায় কষ্ট পাই। শুনেছি, গুরুবায়ুর শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের তেল বাতের রোগে উপকারী।' মহারাজকে বললাম, আমি ফিরে গিয়ে সেই তেল পাঠাব। রোগাক্রমণের পর সঙ্কটাবস্থা কিছুটা কেটে গেলে আমি ফিরে আসার প্রাক্কালে মহাপুরুষজীকে শেষবার দর্শন করি। তিনি কয়েকটি উঁচু বালিশের উপর মাথা রেখে পৃষ্ঠে ভর করে শয্যায় শায়িত ছিলেন—তাঁর মুখমণ্ডল সৌম্য, প্রশান্ত, নির্বিকার। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেই সেবক মহাপুরুষজীকে জানালেন যে, আমি আশ্রমের কাজে মহীশূর ফিরে যাচ্ছি। বাক্‌রোধ সত্ত্বেও তাঁর চোখদুটি যেন কথা বলছিল এবং অন্তরের ভাব বহন করে আনছিল। মহাপুরুষজীর মুখখানি আশীর্বাদের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমার প্রতি তাঁর আশীর্বাদ আত্মপ্রকাশ করছিল তাঁর বাম হস্তোত্তোলনে। তিনি সেবককে ইঙ্গিতে জানালেন মহীশূরস্থ চামুণ্ডা দেবীর এবং মহীশূর আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার জন্য আমার হাতে কিছু টাকা দিতে। আমি সে অর্থ পবিত্র ন্যাস হিসাবে গ্রহণ করলাম এবং মহীশূরে পৌঁছে মহাপুরুষজীর ইচ্ছানুযায়ী পূজার বন্দোবস্ত করলাম। মহাপুরুষজীর বিশেষ আরাধ্যা দেবী চামুণ্ডা এবং ইষ্টদেব শ্রীরামকৃষ্ণের পূজার প্রসাদ তাঁকে যথাসময়ে পাঠিয়ে দিলাম। অখণ্ডানন্দজী যে তেল চেয়েছিলেন সেটাও তাঁকে পাঠাই। মহাপুরুষ মহারাজ ও অখণ্ডানন্দজীর সাথে আমার সম্পর্কের বিবরণ এই পর্যন্তই।

"মঠে আমি যখন ব্রহ্মচারী অবস্থায় ছিলাম তখন পূজনীয় খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দজী) থাকতেন স্বামীজীর শয়নঘরের উত্তরদিকের ঘরে। আমি মাঝে মাঝে কিছু সময় তাঁর সাথে কাটাতাম। তিনি কখনো বারান্দায় শুয়ে থাকতেন এবং তারিয়ে তারিয়ে হুঁকোতে তামাক খেতেন। তাঁর কাছে আমার কোন সঙ্কোচ ছিল না। আমি পাশে বসে তাঁর সেবা করতাম। তিনি আমার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে সরলভাবে কথা বলতেন। ঠিক যেন ছোট্ট একটি শিশু, একটি 'খোকা'।

"১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমি মঠে আসি। অনুষ্ঠান শেষে বেনারসে যাই। সেখানে বিশ্বনাথ দর্শন করে এলাহাবাদে আমাদের মঠে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে সঙ্ঘাধ্যক্ষ বিজ্ঞানানন্দজীকে প্রণাম করলাম। সেদিনটি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল। স্থানীয় এক বাঙালী ভক্তের বাড়ীতে আমার দুপুরের আহারের ব্যবস্থা ছিল। এত ভাল দুপুরের খাবার আগে কখনো খাইনি। এরপর বারাণসী ও কলকাতা ঘুরে মহীশূর ফিরে গেলাম।

"আমার সুযোগ হয়েছিল স্বামী অভেদানন্দজীকেও দর্শন করার। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতার টাউন হল-এ অভেদানন্দজীর বক্তৃতা শুনেছিলাম। তাঁর বক্তৃতা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। ঐ উপলক্ষে ' ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট'-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বক্তৃতা করেন। আমি সেখানেও উপস্থিত ছিলাম।

"শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের সঙ্গে এই আমার সম্পর্কের খতিয়ান। তবে মহাপুরুষ মহারাজের উপদেশ নির্দেশই আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভে আমাকে বিশেষভাবে প্রেরণা যোগাত। আমি মহারাজকে লিখতাম, তিনিও যথাযোগ্য উত্তর দিতেন। চিঠিতে তিনি আমাকে সম্বোধন

করতেন—'প্রিয় যতিচৈতন্য' অথবা শঙ্করণ'। ১৯২৭ থেকে ১৯৩১—এই পাঁচ বছরে সব মিলিয়ে আমি মহাপুরুষ মহারাজকে প্রায় আটখানা চিঠি লিখি। আধ্যাত্মিক উন্নতির নির্দেশনামা পেতেই আমি তাঁকে লিখতাম। মহারাজ উত্তর দিতেন এবং তাতে আমার উপযোগী সমস্ত উপদেশই থাকত। ১৯২৭-এর ডিসেম্বরে বারাণসী থেকে পাঠানো একটি চিঠিতে মহাপুরুষজী লিখেছিলেন ঃ 'তোমার চিঠি পেয়ে আমি আনন্দিত।... যদি তোমার আত্মবিশ্বাস থাকে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপার উপর নির্ভরশীল হও তবে তোমার সাফল্য অবধারিত। যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত, তাকে সাহায্য করতে তিনি এগিয়ে আসেন—এটা তাঁর স্বভাব। সর্বদা জানবে যে, তাঁর কল্যাণহস্ত তোমাকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করে চলেছে।'

"ব্রহ্মচর্য নিতে যখন মঠে আসি, তখন কথামৃতকার মাষ্টারমশাইয়েরও পুণ্যদর্শন লাভ করি। একদিন সন্ধ্যায় দুজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমি তাঁর বাড়ীতে যাই। সেদিন তিনি আমাদের সঙ্গে একটানা প্রায় তিনঘণ্টা কেবল ঠাকুরের প্রসঙ্গই করেছিলেন। বিদায় নিয়ে যখন উঠে আসছি তখন তিনি আমাদের এক ঝুড়ি ফল-মিষ্টি দিলেন। ঝুড়িটি তাঁর হাত থেকে নেওয়ার সময় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলি কি ঠাকুরকে নিবেদন করার জন্য? মাষ্টারমশাই বললেন, 'না, না, সাধুদের জন্য ; সাধুরা খেলেই হবে। ঠাকুর আমাকে বলেছেন সাধুসেবা করতে।' ঝুড়িটি নিয়ে এসে আমি মঠের ভাণ্ডারে দিয়ে মাষ্টারমশাই-এর ইচ্ছার কথা বললাম।"

সন্ন্যাসের পর রঙ্গনাথানন্দজী আবার ফিরে গেলেন নিজের কর্মক্ষেত্র মহীশূর আশ্রমে। সে সময়ে আশ্রমের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না, বাইরে ভিক্ষাতেও বেরতে হত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, মহাপুরুষ মহারাজ তাঁকে সন্ন্যাসের আগেই গেরুয়া পরে ভিক্ষার অনুমতি দিয়েছিলেন। এসময়ে আশ্রমের নানাবিধ কাজের সঙ্গে সঙ্গে চলত তাঁর শাস্ত্র ও বিশেষ করে স্বামীজীর বাণী ও রচনার অধ্যয়ন ও গভীর মনন। গীতা, বিবেকচূড়ামণি এবং কিছু উপনিষদের শ্লোক তিনি এ সময়ে কঠোর নিয়মের সঙ্গে মুখস্থ করেছিলেন। এ সময়েই যোগাসনে পারদর্শী একজন ব্যক্তির কাছে যোগাসনের পাঠ নেন। এবং সে অভ্যাস চিরদিন অটুট রেখেছিলেন। ১৯৩২ সালে মহীশূরে শুরু হয়েছে স্টাডি সার্কেল। সেখানে অন্যান্য সন্ন্যাসী পড়ুয়াদের মধ্যে তিনিও যোগদান করতেন। যদিও তিনি তখন ব্রহ্মচারী যতিচৈতন্য। অন্যান্য সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন—স্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী বিমুক্তানন্দজী, স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী, স্বামী তপস্যানন্দজী প্রমুখ। সেখানে ব্রহ্মসূত্রের রামানুজ ভাষ্য পড়লেন বিখ্যাত পণ্ডিত এ. ডি. এল. শ্রীনিবাসাচারিয়ার কাছে এবং শঙ্কর ভাষ্যসহ 'ব্রহ্মসূত্র' পড়লেন স্বনামখ্যাত পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য আয়ারের কাছে।

মহীশূর আশ্রমে স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের জন্য যে ছাত্রাবাস ছিল, তার তত্ত্বাবধান তিনিই করতেন। ছাত্রদের নিয়ে খেলাধূলা, সাঁতার, জিম্‌ন্যাস্টিক, কুস্তি, ভলিবল খেলা চলত। আর কথায় কথায় ছাত্রদের মধ্যে স্বামীজীর কথা আলোচনা এবং তাদের ত্যাগ ও সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা চলত। মহীশূরেই ১৯২৭ সালে সিদ্ধেশ্বরানন্দজী ও তিনি গান্ধীজীকে প্রথম দর্শন করেন। এরপরেও তাঁকে দেখেন ব্যাঙ্গালোরে ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। মহীশূর পর্বে তাঁর স্মৃতিধৃত সামান্য বিবরণ ঃ "১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত

মহীশূর আশ্রমে থাকাকালীন আমি তখনকার একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ পড়তে খুব ভালবাসতাম। গ্রন্থটির নাম—'ক্যারেক্টার অ্যাণ্ড দ্য কনডাক্ট অব লাইফ', লেখক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর উইলিয়াম ম্যাকডুগাল। গ্রন্থটির একটি কথা আমাকে খুব আকর্ষণ করেছিল এবং সেটি আমি পরবর্তী কালে আমাদের নবীন প্রজন্মের কাছে বক্তৃতায় বহুবার বলেছি। সেটি এই ঃ 'অল্পবয়সীরা চায় প্রশংসা পেতে কিন্তু তার চেয়ে ভাল হল প্রশংসনীয় হয়ে ওঠা।'

"রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দেওয়ার পর আমি যেসব সেবাকর্মে নিযুক্ত ছিলাম, তাদের মধ্যে একটি ছিল জেলবন্দী আসামীদের কাছে ভাষণ দেওয়া। এটা প্রথম শুরু হয়েছিল ১৯৩৩-৩৪-এ মহীশূর জেলে। সেখানে জনা কুড়ি বন্দী আসত। তারপর শুরু হল ব্যাঙ্গালোর জেলে। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য স্বামী সোমানন্দ এই কার্যের সূত্রপাত করেছিলেন অনেক বছর আগে, তখনকার মহীশূর সরকারের আহ্বানে। জেলের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছোট মন্দির ছিল এবং পূজার জন্য সামান্য কিছু অর্থও মঞ্জুর করা হয়েছিল।"

১৯৩৫ সালে স্বামী চিন্মাত্রানন্দজীর সঙ্গে রঙ্গনাথানন্দজী চলে আসেন ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের কর্মী হিসাবে। যদিও তখন অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী। আবার আশ্রমের সব কাজেই মহারাজ আগ্রহের সঙ্গে লেগে পড়লেন। এ সময়ে বেশ কিছু তরুণ যুবক ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে যাতায়াত শুরু করেছে। তাদের কাছে তখন ব্যাঙ্গালোর আশ্রম শান্তির নিবাস, স্বস্তির নিকেতন। স্বাভাবিকভাবে এদের দলপতি উদ্যমশীল যুবক সন্ন্যাসী স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী। এদের খেলার সাথীও তিনি। এছাড়া যুবকদের নিয়ে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন ও ছোটখাটো সেবাকাজে আত্মনিয়োগ ছিল তাঁর দৈনন্দিন কাজের অন্যতম। এমনকি তাদের নিয়ে কখনো কখনো কোথাও বেড়াতে যেতেন, তীর্থ দর্শন এমনকি বনভোজনেও মাঝে মধ্যে যেতেন। এ সময় 'বিবেক সাধনা সঙ্ঘ' শুরু হল। হাতে লেখা পত্রিকা চালু হল। সব কিছুর উদ্দেশ্য স্বামীজীর আদর্শে যুবকদের জীবন তৈরী করা। সে সময়ের কিছু কথা মহারাজের ভাষায় ঃ "আমি ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে এলাম ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। সোমানন্দজী দেহত্যাগ করলেন তার পরের বছর। তারপর আমাকে এই কাজের (জেলবন্দী আসামীদের কাছে ভাষণ) ভার নিতে হল। সানন্দে আমি প্রত্যেক রবিবার সকালে ওই কাজ করতাম। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজন বন্দী আসত। আমি তাদের কাছে কিছু জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ভাবনা ও গীতা থেকে কিছু ভাব তুলে ধরতাম—তাদের তা ভাল লাগত। সেই বছরের কোন একসময়ে আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, আমার শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে কিছু নতুন ধরণের বন্দী—যেমন দুজন কংগ্রেস নেতা—এইচ. সি. দাসাপ্পা, যিনি পরে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী হয়েছিলেন এবং চেঙ্গালারায়া রেড্ডী, যিনি পরে মধ্যপ্রদেশের গভর্নর হয়েছিলেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী পালন উৎসব উপলক্ষে ব্যাঙ্গালোর সেণ্ট্রাল জেলে হরিকথা-র আয়োজন করা হয় ; পরিবেশন করেন একজন জনপ্রিয় কথক। তারপর সকল বন্দীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও উপস্থিত ছিলেন। পরে বন্দীরা একে একে এসে আমাকে প্রণাম করে একটা করে বড় লাড্ডু নিয়ে গেল। সব মিলিয়ে এক হাজার বন্দী ছিল। তাদের কয়েকজন বলল, 'আমরা এমন আনন্দ আগে কখনো পাইনি, আমাদের দারুণ ভাল লেগেছে।' "

১৯৩৯ সালে মহারাজকে পাঠানো হয় তখনকার বার্মায় (বর্তমান মায়ানমার)। তিনি সেখানের রেঙ্গুন (ইয়াঙ্গন) রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটির সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজ করেন ১৯৪২ সাল পর্যন্ত। যথারীতি বার্মার বিভিন্ন অঞ্চলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ ও বেদান্ত প্রচারে যুক্ত হন। সমাজের শিক্ষিত উঁচু মহল থেকে শুরু করে সাধারণ জনমানসে তাঁর বাগ্মিতা ও সরল অনাড়ম্বর জীবন সকলের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি বিভিন্ন বর্ণ ও ধর্মের মানুষও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে সেখানকার সরকারের আমন্ত্রণে তিনি সেখানকার বিখ্যাত বা কুখ্যাত ইনসেন জেলে যেতেন, যেখানে তখন ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দীদেরও পাঠাতেন। ১৯৪১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর সকাল ১০ টার সময় জাপানী বাহিনী রেঙ্গুন শহরে বোমাবর্ষণ শুরু করে। জাপানী আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে যখন হাজার হাজার ভারতীয় পায়ে হেঁটে দেশে ফিরতে বাধ্য হলেন, তখন তাঁদের মধ্যে প্রোম জেলায় সেবাকার্য চালালেন এই তরুণ সন্ন্যাসী। উল্লেখ্য, সে সময়ে রেঙ্গুন শহরে রামকৃষ্ণ মিশন চ্যারিটেব্‌ল হসপিটাল খুব সুনামের সঙ্গে কাজ করছিল। তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার কালে মিশনের সন্ন্যাসী কর্মীদেরও সাময়িকভাবে ভারতে ফিরে আসতে হয়। রঙ্গনাথানন্দজী ও আরও কয়েকজন প্রোম-টুংগাপ রোড ধরে চট্টগ্রাম অভিমুখে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হন। পথে তাঁরা কলেরায় অগণিত মুমূর্ষু মানুষের সেবা শুশ্রূষা করেন।

তাঁরা একটি ব্যবসায়ী নৌকা ভাড়া নিয়ে চকপিউ শহর অভিমুখে সমুদ্রে ভেসে পড়েন। পথে নৌকাডুবি হয়ে অনেক লোক মারা যায়। জলাভাবে সকলেই মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। সমুদ্রের নোনা জল মুখে দেওয়া যায় না। হঠাৎ একটি দ্বীপ লক্ষ্য করা গেল, সেখানে নারকেল গাছ আছে। হয়ত মিষ্ট পানীয় জলও আছে। কিন্তু সেখানে মগেরদের বাস। তারা তাঁদের দেখে তেড়ে এল। মাঝি তাদের ভাষা জানতো। সে তাদের বোঝালো যে এই নৌকায় কয়েকজন 'ফুঙ্গি' অর্থাৎ সাধু আছেন, তাঁরা জলের অভাবে মৃতপ্রায়। তখন তারা নৌকায় আসে এবং রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজকে দেখে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। জলের ব্যবস্থাও করে দেয়। আবার মাঝসমুদ্রে পাড়ি দিলেন তাঁরা। পরে যখন জাপানীরা আরও এগোতে থাকে এবং প্রোম শহর দখল করে নেয় তখন তাঁরা যাত্রীবাহী একটি স্টিমারে বার্মা ত্যাগ করেন এবং ১৯৪২ সালের মার্চে চট্টগ্রাম ও ঢাকা পৌঁছান। জলপথটুকু ছাড়া তাঁরা সকলে পায়ে হেঁটেই এসেছিলেন। রঙ্গনাথানন্দজীকে প্লেনে বা জাহাজে আসার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি জনগণের সঙ্গে থাকা বেছে নিলেন। পথে আহার্য বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু পাওয়া যায়নি ; যা মিলেছিল তা-ই তাঁকে খেতে হয়েছিল। এরপর তিনি ঢাকা থেকে বেলুড় মঠ ফিরে এলেন। মঠে তিনি যখন পৌঁছলেন, তখন তাঁর পাকযন্ত্রের প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেছে। ওজন ৩৫ কেজিতে এসে ঠেকেছে। ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁকে কনখলে যেতে বলা হল। কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানালেন, ওখানে একজন করিৎকর্মা ব্রহ্মচারী আছে, সে আপনার ভালমতো যত্ন করতে পারবে। এর পরের কথা স্বামী সর্বগতানন্দজী (উক্ত ব্রহ্মচারী)-র নিজের ভাষায় ঃ "তারপর তাঁরা আমাকে চিঠিতে লিখলেন, 'রঙ্গনাথানন্দজী আমাদের এক অমূল্য সম্পদ, সযত্নে ওঁর পরিচর্যা করবে'। আমি তাঁকে

নিয়ে আসতে রেলষ্টেশনে গেলাম। রঙ্গনাথানন্দজী এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন যে হাঁটতেও পারছিলেন না। আমরা ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়ে তাঁকে সেবাশ্রমে নিয়ে এলাম। তাঁর চিকিৎসার জন্য আমি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ করলাম। চারমাসে তিনি অনেকখানি সামর্থ্য অর্জন করলেন, এমনকি আমাদের সঙ্গে ভলিবলও খেলতে লাগলেন।

"রঙ্গনাথানন্দজী স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার পর বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ তাঁকে করাচি কেন্দ্রের দায়িত্ব দিলেন। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে তিনি করাচি চলে গেলেন এবং ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলাম। তাতে তিনি যারপরনাই আনন্দিত হলেন। তিনি এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি তাঁর সঙ্গে কাটাতাম ; তিনি শুধু একজন পণ্ডিত নন, একজন উচ্চকোটির সাধুও বটে।"

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে থাকাকালে বেশ কয়েকটি যুবক রঙ্গনাথানন্দজীর সংস্পর্শে স্বামীজীর ত্যাগ ও সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হচ্ছিল। তাদের অনেকেই ইতিমধ্যে সঙ্ঘের বিভিন্ন কেন্দ্রে যোগদান করে। তাদের মধ্যে কয়েকজনকেই মহারাজ করাচিতে কর্মী হিসেবে পেলেন। করাচি কেন্দ্রে রঙ্গনাথানন্দজীর গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। কখনো কখনো শ্রোতার সংখ্যা হাজার থেকে দেড় হাজার পর্যন্ত হোত। সমগ্র সিন্ধু প্রদেশে মহারাজের প্রজ্ঞা ও মানবদরদি হৃদয়ের খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানে সেবা কাজের জন্য হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেনসারি ও Eye-Clinic দুই জায়গায় চলতে থাকে। তাতে মুসলমান ডাক্তারও ছিলেন। প্রচারের জন্য ম্যাগাজিন চালু হল। তখন ১৯৪৬-৪৭ সাল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছে। ভারত-পাকিস্থান দেশ বিভাগ হয়ে গেল। মঠ কর্তৃপক্ষ তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে করাচি মঠ ও মিশন কেন্দ্রটি বিক্রী করে সকলকে ভারতে ফিরে আসতে নির্দেশ দেন। ৯ই আগষ্ট ১৯৪৮ রঙ্গনাথানন্দজী প্লেনে দিল্লী ফিরে এলেন এবং সঙ্গে আনা সব টাকা পয়সা বেলুড় মঠে 'করাচি ফাণ্ড' নামে জমা করলেন। মহারাজের ইচ্ছায় কয়েক বছর পরে সেই টাকা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য সুলভ মূল্যে প্রকাশনার জন্য বেলুড় মঠে দুটি ফাণ্ড করে রাখা হয়, যা থেকে বর্তমানে যুব সম্প্রদায়ের পাঠযোগ্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য কখনো বিনামূল্যে, কখনো বা সুলভে বিতরিত হচ্ছে।

এরপর রঙ্গনাথানন্দজী নতুন দায়িত্ব নিয়ে গেলেন দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন-এর সম্পাদক রূপে। সেখানে তাঁর অবস্থানকাল অক্টোবর ১৯৪৯ থেকে মার্চ ১৯৬২ পর্যন্ত। এসময়ের মধ্যে তিনি দিল্লীতে বিশাল গ্রন্থাগার ও প্রেক্ষাগৃহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তকের গ্রন্থাগার এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদনা করেন। এখানে থাকাকালেই ১৯৬১ সালে রঙ্গনাথানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠের অছি ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন।

এপ্রিল ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্কের সম্পাদক এবং সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট School of Humanistic and Cultural Studies-এর নির্দেশক (Director) ও তার মাসিক মুখপত্রের (Bulletin) সম্পাদনার দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন।

১৯৭৩ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত মহারাজ ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ, হায়দ্রাবাদ-এর অধ্যক্ষ। সেখানে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার প্রদত্ত আট একর জমির উপর তিনি গড়ে তুলেছিলেন Vivekananda Institute of Education and Culture, বিবেকানন্দ স্বাস্থ্যকেন্দ্র (Vivekananda Health Centre) এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির। অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচীগুলিও তিনি রূপায়িত করেন।

হায়দ্রাবাদ মঠে থাকাকালীন রঙ্গনাথানন্দজীর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১লা এপ্রিল ১৯৮৯-এ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়া। শুরু হয় তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায়। সহাধ্যক্ষরূপে দীক্ষাদানের গুরুদায়িত্ব পালনের মাধ্যমে অগণিত নরনারী তাদের জীবনে পেল আলো, আনন্দ ও শান্তির দিশা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—মহারাজ দীক্ষা দান করতে যেন কিছুতেই আগ্রহ প্রকাশ করছেন না। এ সময় মঠের কর্তৃপক্ষের প্রবীণ দু-একজন সন্ন্যাসী পূজ্যপাদ মহারাজকে দীক্ষা দান শুরু করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। তাঁরা বলেন, "আপনাকে দীক্ষা দিতে হবে।" মহারাজ বললেন, "ঠাকুরের নামই তো সারা জীবন প্রচার করছি, এই তো দীক্ষা, আবার কী দীক্ষা দিতে হবে?" তখন তাঁরা বলেন, "না মহারাজ, আনুষ্ঠানিক দীক্ষা দিতে হবে।" ঘটনাচক্রে মহারাজ তখন অসুস্থ হয়ে রয়েছেন বেলুড় মঠের আরোগ্য ভবনে। বাংলা কথামৃত চেয়ে নিয়ে খুব পড়ছেন। মনে হল তাঁর মনে একটা পরিবর্তন এল। উপাসনা পদ্ধতি তৈরীর দায়িত্ব দিলেন উপযুক্ত এক সন্ন্যাসীকে। এর মধ্যে বেশ কিছু ভক্তের আবেদন জমা পড়েছে। সেগুলো নিয়ে তাঁর ভাবী সচিব তাঁকে দেখাতেই তিনি ভক্তদের সাক্ষাৎকার নিতে চাইলেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ মহিলা ভক্ত এবং তাঁকে হাসপাতালে সেবা করেছেন এরকম কিছু নার্স। সাক্ষাৎকারে তাদের ব্যাকুলতা ও আন্তরিকতা লক্ষ্য করে মহারাজ খুব খুশী হলেন। সচিবকে দিন নির্দিষ্ট করতে বললেন। সেই মতো দীক্ষার দিন স্থির হলো ৯ই মে ১৯৯০, স্থান ঃ কাশীপুর মঠ। ৩৫ জনের দীক্ষা হয়ে গেল।

ভারত সরকারের আহ্বানে মহারাজ প্রতিবৎসর National Academy of Administration-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের কাছে বক্তৃতা দিতেন—প্রথমে দিল্লী ও পরে মুসৌরীতে।

১৯৬৪-৬৭ পর্যন্ত তিনি Indian National Commission for Co-operation with UNESCO কমিশনের সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন বক্তৃতা সফরকালে মহারাজ বিশ্বের ৫০টিরও বেশী দেশ ভ্রমণ করেছেন, যাদের মধ্যে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন (USSR), আফগানিস্থান, ইরান, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, জাপান ও চারটি ব্যতীত দক্ষিণ আমেরিকার প্রতিটি দেশ। এই বক্তৃতা সফরকালে তিনি প্রায় প্রতিদিন অক্লান্তভাবে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেছেন। এর মধ্যে অধিকাংশ সফরই ভারত সরকার কর্তৃক আয়োজিত হয়েছিল।

বহু বৎসর যাবৎ মহারাজ হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলি এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারাগুলি গভীরভাবে অনুধ্যান করেছেন। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, চিন্তাধারা

বা ঘটনাবলীও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। তাই তাঁর বক্তৃতাগুলি হয়ে উঠেছে প্রাচীন ও আধুনিকের এক অদ্ভুত মিলনভূমি। সেগুলির মধ্যে আলোচিত হয়েছে শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধের আলোকে বর্তমান সমস্যাসমূহ ও বেদান্তমতে মানবের দেবত্বের ধারণা। কলকাতা, কানপুর, গুয়াহাটি ও ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং Tata Institute of Social Sciences, মুম্বাই-এর অনুরোধে মহারাজ তাদের convocation বা সমাবর্তন সমাবেশে ভাষণ দেন।

জীবনে তিনি বহু সেবামূলক কাজে যোগদান করেছেন। যখন তিনি করাচিতে, তখন ১৯৪৩ সালে বাঙলায় চলছে পঞ্চাশের মন্বন্তর। সেসময়ে তিনি ১২৪০ টন চাল যোগাড় করে জাহাজে করে ভারতে পাঠান। তখন এক সের চালের দাম যেখানে করাচিতে ৯ টাকা, বাঙলায় সেই চালের আকাশছোঁয়া মূল্য ১০০ টাকা। তাও দুষ্প্রাপ্য।

আবার ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় ও বিভিন্ন সময়ে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে তিনি সর্বদাই মঠ-মিশনের ত্রাণকার্য সুসংগঠিত করতে এগিয়ে এসেছেন। পল্লীমঙ্গলের বিভিন্ন সেবাকার্যেও ছিল তাঁর অপরিসীম আগ্রহ। অক্টোবর ১৯৪৭-এ মিশন কর্তৃপক্ষ কুরুক্ষেত্রে বিরাট আকারে 'পূর্ব পাঞ্জাব উদ্বাস্তু পুনর্বাসন' নামে ত্রাণকার্য শুরু করে। ঐ কাজের জন্য বেলুড় মঠ করাচি কেন্দ্র থেকে কর্মী চাইলে রঙ্গনাথানন্দজী তৎক্ষণাৎ ঐ কেন্দ্রের একজন তরুণ সন্ন্যাসীকে পাঠিয়ে দেন।

১৯৪৯ সাল। তখন তিনি দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দেশ বিভাগের ফলে পাকিস্তান থেকে বহু মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে আসছেন। দিল্লীর বিভিন্ন অঞ্চলে তারা তাবু খাটিয়ে রয়েছেন। সে সময়ে ভারত সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ থেকে বহু কম্বল জোগাড় করে মহারাজ আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারীদের নিয়ে নিজে সেই কম্বল বিতরণ করেছেন।

এত ব্যস্ততার মধ্যেই মহারাজ লিখেছেনও প্রচুর। তাঁর প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে রয়েছে—The Message of the Upanishads (with an appendix consisting of his correspondence with Sir Julian Huxley), Eternal Values for A Changing Society (4 volumes), A Pilgrim Looks at the World (2 volumes), Roles and Responsibilities of Teachers in Building Modern India, Children : Humanity's Greatest Asset, Women in Modern Age, Divine Grace, The Indian Vision of God as Mother, Science and Religion, Practical Vedanta and the Science of Values, Universal Message of Bhagavad Gita (3 volumes), Brihadaranyak Upanishad প্রভৃতি বিভিন্ন ছোট বড় গ্রন্থ রয়েছে।

তাছাড়া তাঁর বহু বক্তৃতা অডিও ক্যাসেটেও পাওয়া যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শ্রীমদ্ভাগবতম্, বিবেকচূড়ামণি, মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ এবং মহাভারতের শান্তিপর্ব।

সঙ্ঘের মধ্যে মহারাজ ছিলেন একজন সত্যকার মিশনারি। অন্তরের গভীরে তাঁর এই জ্বলন্ত পাবকসদৃশ বিশ্বাস ছিল যে, স্বামীজীর সর্বজনীন ধর্মের বাণী, বেদান্ত ও প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের যুক্তিসিদ্ধ আধুনিক ব্যাখ্যা—কেবল এইগুলির সহায়েই ভবিষ্যৎ মানবতার চিন্তাজগতে বিপ্লব আনা সম্ভব। মহারাজের মনে ছিল এই বিশ্বাস এবং ছিল বিশ্বের মানুষের

কাছে এই বাণী, এই সুসমাচার পৌঁছে দেবার এক অনির্বাণ আকুতি। তিনি যেন সারাজীবন এক মিশনারি 'ঘোরের' মধ্যে দিয়ে ছুটে ছুটে গেছেন বিশ্বের আনাচে-কানাচে মানুষের কাছে ; পৌঁছে দিয়েছেন স্বামীজীর প্রাণপদ যুগোপযোগী বাণী।

ভারতীয় সংস্কৃতির দূত হিসেবে মহারাজ সমগ্র বিশ্ব ভ্রমণ করে ধর্মসমন্বয় ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করেছেন। ওঁর সবচেয়ে ব্যাপক সফর ছিল ১৮ই জুলাই ১৯৬৮ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত। মহারাজের হৃদয় জুড়ানো অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা আমাদের সকলের জন্য সঞ্চিত রয়েছে তাঁর বিখ্যাত 'A Pilgrim Looks at the World' গ্রন্থে। এই সফরে তিনি ৯৩৪টি বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর অধিবেশন করেন, যার মধ্যে ৯০টি ছিল টেলিভিশান, রেডিও ও সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার, ৩০টি হয়েছিল চার্চ ও মন্দিরে, ১৪১টি হয় বেদান্ত সোসাইটি ও রামকৃষ্ণ আশ্রমে, ১৫৬টি ছিল ব্যক্তিগত মহলে, ১৯৭টি হয়েছিল প্রকাশ্য আলোচনাসভাতে এবং ৩২০টি হয় ১১৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে। তাঁর প্রতিটি বক্তৃতার পরেই থাকত প্রেরণাদায়ক প্রশ্নোত্তর অধিবেশন। জনসাধারণের উপর মহারাজ যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, প্রচারমাধ্যমগুলি সর্বসম্মতভাবে তার উচ্চপ্রশংসা করে। কয়েকটি উদাহরণ এখানে উল্লেখযোগ্য।

"একদিকে তাঁর অবিশ্বাস্য প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আমাকে শুধুমাত্র মোহিতই করেনি, রোমাঞ্চিত করেছে এবং বৌদ্ধিকভাবে উদ্দীপিত করেছে। অন্যদিকে তাঁর কথা আমাদের গভীর মর্ম স্পর্শ করেছে ; আক্ষরিক অর্থেই আমার অন্তর এই অনুভূতিতে শিহরিত হয়েছে যে, সেখানে উপস্থিত আমরা প্রত্যেকে সত্যিই প্রাণ ও কর্মশক্তিপূর্ণ।" (Ann Curtis in American Reporter, Feb 1969)

David Milofsky, University of Wisconsin-এর Wisconsin Union Literary Committee-র চেয়ারম্যান বলেন, "আপনার সফর আমাদের অভিজ্ঞতার সীমাকে বিস্তৃত করেছে এবং বুঝিয়েছে যে, যদিও আমরা শারীরিকভাবে বিশাল দূরত্বে আছি, তবুও সমস্ত মানুষের মধ্যে একটি বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। আমি অনুভব করি যে, আপনার বক্তৃতার ফলে ভারতবর্ষ ও আমেরিকা এবং বেদান্ত ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মধ্যে দূরত্ব কমেছে।"

আমেরিকার পোর্টল্যাণ্ডের KGW রেডিওতে (৩১শে জানুয়ারী ১৯৬৯) রাত দশটায় মহারাজের একটা লাইভ অনুষ্ঠান ছিল—কুড়ি মিনিটের। সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন মিস্টার এফ. নামের এক যুবক সাংবাদিক যিনি এমনিতে ভদ্র কিন্তু সব ধর্মের প্রতি কিছুটা আক্রমণাত্মক, সব ধর্মগুরুর প্রতি কিছুটা সংশয়ী ও ব্যঙ্গকারী। রঙ্গনাথানন্দজীর সঙ্গে কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম ঘটল। সাক্ষাৎকার কিছুটা এগোতে না এগোতেই পরিবেশ বদলে গেল। মহারাজের মেধা, বোধের গভীরতা, সততা ও গভীর মানবপ্রেমের কাছে মিস্টার এফ-এর আপাত লঘুতা-চপলতা ভেসে গেল, এবং তাঁরই আগ্রহে অনুষ্ঠানটি কুড়ি মিনিটে শেষ হল না। যথার্থ জিজ্ঞাসুর মনোভাব নিয়ে তিনি একের পর এক প্রশ্ন করলেন, মহারাজ ধৈর্যসহকারে সবগুলির উত্তর দিলেন। মাঝে মাঝে শ্রোতারাও 'কল' করলেন। অনুষ্ঠান যখন শেষ হল, রাত তখন বারটা।

দেখতে দেখতে ১৯৯৮ সাল চলে এল। সে বছরটি মঠ মিশনের কাছে বড়ই সঙ্কটের বছর। একই সঙ্গে প্রায় অন্তিম শয্যায় পূর্বতন সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজী কলকাতার কোঠারী মেডিকেল সেণ্টারে ও সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ রঙ্গনাথানন্দজী উডল্যাণ্ডস্ হাসপাতালে। সকলের মনেই আশঙ্কা, উদ্বেগ। সকল আশঙ্কার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে ১৯৯৮ সালের ১০ই আগষ্ট সঙ্ঘের দ্বাদশ অধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহাসমাধিতে প্রবেশ করলেন। প্রথম দুদিন প্রবীণ সঙ্ঘচালকেরা অসুস্থ রঙ্গনাথানন্দজীকে সে সংবাদ দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তৃতীয় দিনে অপারগ হয়ে কর্তৃপক্ষের বর্ষীয়ান্ দুজন সন্ন্যাসী পূজ্যপাদ মহারাজের কাছে যান এবং খুব দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে মৃদুস্বরে ভূতেশানন্দজীর দেহাবসানের সংবাদ দেন। ধীর শান্ত নেত্রে টেবিলের উপরে রাখা ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে মহারাজ শুধু বললেন, "তাঁর ইচ্ছা।" এরপর একজন বলেন, "মহারাজ আপনিই এখন আমাদের প্রেসিডেন্ট।" মহারাজ চোখদুটো বিস্ফারিত করে বিস্ময়ের সুরে বলেন, "কী আশ্চর্য! মহীশূর আশ্রমের রাঁধুনি আজ সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট হতে চলেছে? ঠাকুরের কি ইচ্ছা!"

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ রঙ্গনাথানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ রূপে সেই পদে বৃত হলেন। শুরু হল বিশ্বজোড়া রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের প্রধান নায়ক রূপে সঙ্ঘ এবং সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারী, অগণিত দেশসেবক ও ভক্তবৃন্দকে সঠিক পথে পরিচালনার মহান ভূমিকা। সঙ্ঘাধ্যক্ষ হয়ে বেলুড় মঠে সর্বপ্রথম দীক্ষা প্রদান করেন ৫৬ জন দীক্ষার্থীকে ৪ঠা নভেম্বর ১৯৯৮। যদিও, এরই মধ্যে গোলপার্কে থাকাকালে তিনি ১৪ই সেপ্টেম্বর একজন প্যালেস্টানীয় ভক্তের আগ্রহে তাকে ঠাকুরের নাম দেন।

বেলুড় মঠে দীক্ষার্থীর সংখ্যা সব সময়ে বেশী থাকায় মহারাজ ইচ্ছা করলেও সকলের সাক্ষাৎকার নিতে পারতেন না। তবে দীক্ষার দিন শুরুতে ঠাকুর ও মায়ের সম্পর্কে কিছুটা বলে ভক্তদের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'মায়ের পদপ্রান্তে'—বইগুলি পড়তে বলতেন। স্কুল কলেজের ছেলে-মেয়েরা দীক্ষা নিতে চাইলে মহারাজ খুব খুশী হতেন। প্রত্যেক দীক্ষার দিনই যুবক বা যুবতীদের প্রতি তাঁর একটা বিশেষ নজর লক্ষ্য করা যেত।

চিরদিনই মহারাজের স্বাস্থ্য ছিল সবল ও সুঠাম। সমসাময়িক সাধু ব্রহ্মচারীরা তাঁকে সংক্ষেপে ডাকতেন A. D. G. অর্থাৎ আরোগ্য দৃঢ় গাত্র (Healthy Strong Body)। তবু শেষের কয়েক বছর ধরে মাঝে মাঝেই মহারাজের শরীর অসুস্থ হচ্ছিল। ২০০১ সালে brain-stem stroke হয়েছিল। সেবার যেভাবে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন, তাতে ডাক্তাররাও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ২৩শে জানুয়ারী ২০০৪ বেলগাঁও রামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির ও প্রার্থনাগৃহ শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছেও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার ফলে সেই শুভ কাজ তিনি সম্পাদন করতে পারেননি। ব্যাঙ্গালোর থেকে তাঁকে ফিরে আসতে হয় বেলুড় মঠে। ১৯৯৮ সালের বড় অসুস্থতার পর মহারাজ প্রায়ই বলতেন, "এখন তো আমার extension চলছে।" শেষের দিকে কখনো কখনো ডাক্তার ও কাছের সেবকদের তাঁর হাতটি উপরে তুলে দেখিয়ে বলতেন, "এই চলে যাব।" কখনো বলতেন, "উপরে চলে যাব।" কখনো বলতেন, "ঠাকুরের কাছে চলে যাব।" এমনকি দু'এক সময়ে বলেছেন, "এই সামনের অমুক মাস পর্যন্ত।" সেই মাসটি কেটে যাবার পর সেবকরা মজা

করে মহারাজকে স্মরণ করিয়ে দিলে মহারাজ শিশুসুলভ হাসি হেসে বলতেন, "যাব তো, কিন্তু ঠাকুর যে যেতে দিচ্ছেন না।" প্রতি বছরই শ্রীসারদা মঠে মহারাজ ভাণ্ডারা দিতেন। খাওয়া দাওয়া ছাড়া কিছু উপহার দেবার জন্য কিছু টাকা পাঠাতেন। এভাবে ভাণ্ডারা দেওয়া হল বেশ বড় করে। বলেছিলেন, "খাওয়া দাওয়া ভাল এবং উপহার যেন সুন্দর হয়।" তাই মায়ের ছবি বসিয়ে HMT ঘড়ি দেওয়া হল ১৪৩ জনকে।

স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটা অধিগ্রহণ ও সংস্কারের কাজ বহুদিন ধরেই চলছিল। মহারাজ এ ব্যাপারটিতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করতেন ও উৎসাহ দিতেন। অবশেষে সেখানে Ramakrishna Mission Swami Vivekananda's Ancestral House & Cultural Centre তৈরী হয়। কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন রঙ্গনাথানন্দজী, ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০০৪-এ। সেদিন মহারাজ সংক্ষিপ্ত ভাষণও দেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, দেহাবসানের কয়েকমাস আগে বিবেকানন্দ (ডিম্‌ড্) ইউনিভার্সিটি স্থাপনে মিশন অনুমোদন লাভ করলে মহারাজ স্বস্তি বোধ করেন।

এবছরে শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজো পড়ে ৩রা জানুয়ারী। ৪-৬ই জানুয়ারী বেলুড় মঠে তিনদিন ব্যাপী মায়ের আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উৎসব পালনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান পূজনীয় মহারাজ ৪ঠা জানুয়ারী সকালে উদ্বোধন করেন ও আশীর্বাণী প্রদান করেন। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০০৩-এ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথির বৈকালিক ধর্মসভায় মহারাজ উপস্থিত হতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। তিনি উপস্থিত হলে তাঁকে সাদরে মঞ্চে নিয়ে আসা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন যে প্রবীণ সন্ন্যাসী, তিনি উল্লেখ করেন যে, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম কোন অধ্যক্ষ মহারাজ এ ধরণের বৈকালিক ধর্মসভায় উপস্থিত হয়েছেন। মহারাজ সেদিন কয়েক মিনিট মায়ের কথাও বলেন।

২১ ও ২২শে জানুয়ারী গোলপার্কে সেমিনার ছিল। বিষয় ছিল ঃ 'National Seminar on Philosophy and Science of Value Education in the Context of Modern India'। ২১শে জানুয়ারী সেমিনারটি উদ্বোধন করেন মহারাজ এবং সংক্ষিপ্ত একটি বক্তৃতাও দেন।

Gastro-intestinal bleeding-এর জন্য ৭ই জানুয়ারী ২০০৫ মহারাজকে উডল্যাণ্ডস্ মেডিক্যাল সেন্টার, কলকাতাতে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে ১৬ই জানুয়ারী ছাড়া পান এবং ২৬শে জানুয়ারী পর্যন্ত গোলপার্কে থাকেন। ২৬শে জানুয়ারী তাঁকে আবার উডল্যাণ্ডস্-এ ভর্তি করা হয়। ২৯শে জানুয়ারী মহারাজ মঠে ফিরে আসেন।

এ বছরের শুরুতে মহারাজের ITP (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura) হয়। তা থেকেই আন্ত্রিক রক্তপাতের সূত্রপাত। এর জন্যই বারে বারে মহারাজকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় ও রক্ত দিতে হয়।

জানুয়ারীর শেষে যখন মহারাজ হাসপাতালে, মঠে ফেরার জন্য তখন তাঁর তীব্র আকুতি। সামনে স্বামীজীর তিথিপূজোয় (১লা ফেব্রুয়ারী ২০০৫) ব্রহ্মচর্য দীক্ষাপ্রদানের গুরুদায়িত্ব। বারবার ডাক্তারদের বলছেন, "আমি বেলুড় মঠে যাব।" ঠিক দুদিন আগে মঠে ফিরে এলেন। স্বামীজীর জন্মতিথি উৎসবের পরবর্তী উষালগ্নে ৪৫ জন ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মচর্য দীক্ষাপ্রদান করে কৃতার্থ করেন। সেদিন বিকেলে মহারাজের সাথে ব্রহ্মচারীরা গ্রুপফোটো

তোলে এবং মহারাজ গায়ত্রী মন্ত্র ও অন্যান্য কিছু বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দেন। পরে মহারাজের আগ্রহে ব্রহ্মচারীরা তাঁকে গান গেয়ে শোনায়। কয়েকদিনের মধ্যেই আবার গেলেন হাসপাতাল। ভর্তি ছিলেন ১লা থেকে ৭ই মার্চ। শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজো সমাগত। ৪৫ জন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসের প্রতীক্ষায়। মহারাজ বেলুড় মঠে ফিরে আসতে ব্যাকুল হলেন। এবারেও ঠিক দুদিন আগে ফিরে এলেন মঠে। ১২ই মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা উৎসব সুসম্পন্ন হল। ভোর রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে জমাটবাঁধা ভাবগম্ভীর পরিবেশে মহারাজ ৪৫ জন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করে তাদের নবজন্ম দান করলেন। ঘরে ফিরে এসে গুরুপ্রণাম ও নামকরণ অনুষ্ঠানও সর্বাঙ্গসুন্দর হল। এই নিয়ে গত সাত বছরে সাত সাতটি ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস প্রদানরূপ গুরুভার নিষ্পন্ন করলেন।

মাঝে মধ্যেই মহারাজের বাহ্যিক জ্ঞানী বেদান্তিরূপ পরিচিতির আস্তরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসত অত্যন্ত সংবেদনশীল নরম মাতৃহৃদয়টি। ২রা মার্চ ভর্তি আছেন উডল্যাণ্ডস্ হাসপাতালে। আমেরিকার টেক্শাস্ থেকে এসেছেন এক ভক্ত। মনে প্রবল বাসনা মহারাজের কাছে দীক্ষা পাওয়ার। হাসপাতালে দর্শন ও প্রণাম করে মহারাজকে জানালেন তাঁর মনোবাসনা। পরের দিনই তাঁর আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার টিকিট। সঙ্গে তাঁর মা ছিলেন। মহারাজ সেবককে বললেন, "একটা চেয়ার এনে ওকে বসতে দাও। এখানেই ওর দীক্ষা হয়ে যাবে।" মাকে বাইরে যেতে বললেন। বিছানায় শুয়েই মহারাজ তাঁকে কৃতার্থ করলেন : দীক্ষা হয়ে গেল। সেবককে বললেন প্রসাদ দিতে। দেখা গেল কোন প্রসাদ নেই। কাছেই একটা electral-এর প্যাকেট ছিল। তা-ই দিতে বললেন। সর্বশেষ কৃপা করেন তাঁর প্রিয় শিব চতুর্দশীর দিন ৮ই মার্চ চারজনকে। তাঁর দীক্ষিত ভক্তের সর্বমোট সংখ্যা ৫৯,৬৯৩।

১৮ই মার্চ ২০০৫-এ পূজনীয় মহারাজ ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে valedictory function-এ যোগ দিতে আসেন বিকেল ৩.৩০-এ। মহারাজ এখানে বক্তৃতা দেন, যা কিনা তাঁর শেষ বক্তৃতা। দিন কয়েক পর মহারাজ আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে ভর্তি হন। এ সময় অসুস্থতার দরুণ মাঝে মাঝেই মহারাজকে হাসপাতালে যেতে হলেও বেলুড় মঠে থাকাকালীন এ-বয়সেও মহারাজের দৈনন্দিন দিনচর্যার কঠোর নিয়মানুবর্তিতার এতটুকু ব্যত্যয় হতো না।

"You are late"—বলতেন সকালে ডাকতে একটু দেরী হলেই। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদানের পর একজন নবাগত ব্রহ্মচারীকে যেরকম নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থাকতে হয়, সঙ্ঘের সর্বাধ্যক্ষের দৈনন্দিন জীবনও সেরকম একটি নির্দিষ্ট রুটিনে বাঁধা ছিল। তা ছিল এত সাবলীল ও ছন্দময় যে, মনে হত নিয়ম তাঁকে অনুসরণ করছে। ভোরে উঠে জপধ্যান, তারপর ব্যায়াম, সাধু-ব্রহ্মচারীদের প্রণাম গ্রহণ ও খবরের কাগজ পড়া। মাঝে মধ্যে দেশের দুরবস্থার কাহিনী, বিশেষ করে সন্ত্রাস, হিংসা, প্রাণহানি, দুর্নীতি—ইত্যাদি পড়ে ভীষণ বিচলিত হতেন এবং গভীর দুঃখ প্রকাশ করতেন। সেবকেরা এ অবস্থা দেখে কখন কখনও বলত, "কাল থেকে আপনাকে আর কাগজ পড়তে দেব না।" মহারাজ বলতেন, "না-না, পড়তে হবে, জানতে হবে, তারপর তাদের তোলার চেষ্টা করতে হবে।"

সকাল ৮.৩০-এর সময় প্রাতরাশ শেষ করেই শুরু করতেন বই পড়া ও চিঠিপত্র পড়ে উত্তর দেওয়া ইত্যাদি। এই পর্ব চলত ১১টা পর্যন্ত। মাঝে ভক্তদের দর্শন দিয়ে বেলা বারোটার সময় গ্রহণ করতেন দুপুরের প্রসাদ। তবে তাঁর আহারের বহর কিছু ছিল না। বলা বাহুল্য, সেই খাবারের রূপ, স্বাদ এবং পরিমাণ দেখলে একদিন বই দুদিন খাওয়ার প্রবৃত্তি কারো হবে না। কিন্তু খাওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে কখনোই মনে করতেন না। বলতেন, "নিয়ম রক্ষার জন্য খাই।" তবে সূক্ষ্ম রসিকতা ছিল খুব। এই খাবার কিভাবে দিনের পর দিন খাচ্ছেন তা তিনি রসিকতা করে বলতেন, "আমার খাবার খুব সুস্বাদু।" দুপুরের প্রসাদের পর সামান্য বিশ্রাম। বিশ্রামের পরেই আবার পড়াশোনা। ডাক্তারের নির্দেশে আবার একটু ব্যায়াম। বিকেল ৪.৩০-এ টিফিন সারতেন। নষ্ট করার মতো এতটুকু সময় তাঁর ছিল না। তাই টিফিন শেষ হলেই জিজ্ঞাসা করতেন, "এরপর কী?" এরপর হত কথামৃত পাঠ। আবার বই পড়া। বই পড়তেন এত নিখুঁতভাবে এবং মনোযোগ দিয়ে যে, অন্য কেউ সামনে দাঁড়ালেও টের পেতেন না। বই পড়া কখন শুরু করলেন এবং তা কখন শেষ হল, তা বইয়ের পাতাতেই লিখে রাখতেন। প্রয়োজনীয় স্থান দাগাতেন। যতিচিহ্নের সামান্যতম ভুলও তাঁর নজর এড়াতো না। এর পরেই ভক্তদের দর্শন দিতেন। তারপরেই আবার বই পড়া ও হাঁটা। বিছানায় শুয়ে জপ করতে বললে সদা সচেতন মহারাজ তৎক্ষণাৎ বলে উঠতেন, "না, আমি বসে বসেই জপ করব।" জপধ্যান শেষে আবার বই পড়া। রাত ন'টায় প্রসাদ পেয়ে শুতে যেতেন রাত ৯.৪৫-এ।

জ্বর ও সেপ্টিসেমিয়াজনিত rigor-এর জন্য শেষবার হাসপাতালে ভর্তি হন ১৭ই এপ্রিল। যকৃতের গোলমাল ও অন্যান্য উপসর্গও শুরু হয়। সর্বপ্রকার উন্নত সুচিকিৎসার ব্যবস্থা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে মহারাজের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। কিন্তু মহারাজ সদাই প্রফুল্ল। দৃঢ় ও অনমনীয় ভাবের এতটুকুও কমতি যেন লক্ষ্য করা যায় না। শরীরের ব্যাপারে যখনই যে জিজ্ঞাসা করেছেন, "মহারাজ কেমন আছেন?" —মহারাজের তৎক্ষণাৎ বলিষ্ঠ উত্তর, "I am all right ; I am fine।" তৎসত্ত্বেও ২৫শে এপ্রিল সকাল থেকেই মহারাজের অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। তারই মধ্যে বেলুড় মঠের সাধারণ সম্পাদক মহারাজ পূজনীয় মহারাজের সাথে ফোনে সামান্য কথাও বলেন। গলার স্বর খুব ক্ষীণ ও দুর্বল। শুধু একটি কথাই দু'বার শোনা যায়—"আমি বেলুড় মঠ যাব।" অবশেষে বেলা ৩.৫১ মিনিটে অন্তিম মুহূর্ত নেমে এল। মহারাজের হৃদ্‌যন্ত্র স্তব্ধ, অচল। মহারাজ মহাসমাধিতে লীন হলেন।

আকাশবাণী, দূরদর্শনের মাধ্যমে এবং লোকমুখে মহারাজের মহাপ্রয়াণ সংবাদ দ্রুত প্রচারিত হওয়ায় অগণিত মানুষ উডল্যাণ্ডস্ হাসপাতালে সমবেত হতে শুরু করেন। সন্ধ্যা ৬.৩৭ মিনিটে মহারাজের দেহ বেলুড় মঠে নিয়ে এসে সংস্কৃতি ভবনের প্রেক্ষাগৃহে সকলের দর্শনের জন্য শায়িত রাখা হয়। সারারাত ধরে অসংখ্য নরনারী তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে যান। ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছে ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শোকবার্তা। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও শোকবার্তা আসে। পরের দিন ২৬শে এপ্রিল

সমস্ত প্রভাতী দৈনিকে মহারাজের মহাপ্রয়াণ সংবাদ বিশেষ স্থান পাওয়ায় মঠ প্রাঙ্গণে মানুষের সমাবেশ জনপ্লাবনের আকার নেয়। দলে দলে সাধু-ব্রহ্মচারী, শ্রীসারদা মঠের সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণী এবং হাজার হাজার নরনারী মঠ প্রাঙ্গণে শায়িত মহারাজের পূতদেহে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। লোকসভা এবং রাজ্যসভার সদস্যরাও ২ মিনিট নীরবতা পালন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। ১২.৪০ মিনিটে মহারাজের দেহ চিতাগ্নিতে উৎসর্গ করা হয়। চিতাগ্নির লেলিহান শিখা ঊর্ধ্বমুখী হতে হতেই সমবেত সাধু-ব্রহ্মচারীদের কণ্ঠে গীত হয়—"ওই যে দেখা যায় আনন্দধাম ...।"

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় বৈদিক শান্তিমন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। তখন বেলা ৩.১৫। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করে চলে গেলেন। কিন্তু রেখে গেলেন মহিমময় শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে যাপিত একটি অনন্য অনুপম জীবন যা শুধু সাধু-ব্রহ্মচারী তথা ত্যাগীদেরই অনুপ্রেরণামূলক নয় ; বিশ্বের সমগ্র স্তরের মানুষের কাছে আত্মশক্তি বিকাশের এবং উদ্দীপনা লাভের এক আদর্শ মূর্ত বিগ্রহ।

সেই অতুলনীয় জীবনের পরতে পরতে বার বার প্রকাশিত হয়েছে অসামান্য সব দৈবী ও মানবীয় নজীরবিহীন গুণরাশি। সেগুলির সামান্য স্মরণ-মনন ও অনুশীলন সকলের হৃদয় মনকে ধীরে ধীরে বিকশিত করে প্রত্যেকের অন্তরস্থিত চৈতন্যের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা অনুভব করাবে।

এখন আমরা সেই মহাজীবনের নির্যাসস্বরূপ কিছু ঘটনা ও বিশেষত্ব উল্লেখ করব।

পূজনীয় মহারাজ জীবনে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যে-বই প্রথম পড়েন সেটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। এইভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রথম ভালবাসা ও আকর্ষণ। ধীরে ধীরে সেই ভাবটি তাঁর জীবনে ঘনীভূত রূপ পায়।

একবার স্বামী তুরীয়ানন্দজীর সেবক একজন কঠোরী সাধু রঙ্গনাথানন্দজীকে মৃদুভাবে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, অত্যধিক জনপ্রিয়তার কারণের মহারাজের মন বিপথে চলে যেতে পারে। মহারাজ জবাবে বলেছিলেন, "মন যদি আদৌ কোথাও যায়, তবে তা কেবল ঠাকুরের চরণেই যাবে।"

মহারাজ যখন করাচি কেন্দ্রের প্রধান, তখন মঠের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী করাচি এসেছিলেন। সে সময় মহারাজের রবিবারের বক্তৃতা ক্লাসগুলি খুব জনপ্রিয় ছিল। সমাজের বহু গুণী মানী মানুষ তাতে আসতেন। একদিন মাধবানন্দজী স্বয়ং আগ্রহ করে ঐরকম একটি ভাষণে উপস্থিত হয়েছিলেন। পরে তিনি আরেকজন সন্ন্যাসীকে বলেছিলেন, "ঠাকুর শঙ্করকে কোলে নিয়ে খেলা খেলছেন।"

মহারাজ বলতেন, "লেকচারে কী-ই বা আর আছে? ঠাকুরকে দেখ—তিনি কোন ভাষণ দিতে পারতেন না, কিন্তু তাঁর প্রভাবটি দেখ। আসলে যেটির প্রয়োজন, সেটি হল পবিত্র হৃদয়, সৎ উদ্দেশ্য—সেটিই অন্যদের প্রভাবিত করতে পারে।"

মহারাজ ব্রহ্মচারীদের বলতেন, "যখনই সঙ্ঘে যোগ দিয়েছ, তখন থেকেই তোমার দেহটি ঠাকুরের, এটি তাঁর। হিন্দিতে বলে 'তন-মন-ধন সমর্পণ কিয়া।' তোমাদের তনু-মন-ধন সমস্তই শ্রীরামকৃষ্ণে সমর্পিত।"

ঠাকুরের আরাত্রিক ভজনের 'সম্পদ তব শ্রীপদ ভব-গোষ্পদ-বারি যথায়'—কথাটি মহারাজ অনেকবার উচ্চারণ করে বলতেন, "আহা! কি অসাধারণ ভাব! এই জৌলুষময় সংসারের সমস্ত ধনসম্পদ গোষ্পদের বারিতুল্য তুচ্ছ, একবার যদি তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় পাই।"

মহারাজ তখন হায়দ্রাবাদ মঠের অধ্যক্ষ। একবার ঠাকুরের তিথিপূজা উপলক্ষে পূজারী মহারাজ ভালভাবে ঠাকুরঘর সাজাতে চাইলে মহারাজ বলেন, "আমাদের ঠাকুর ছিলেন খুব সাদাসিধে ; মাত্রাতিরিক্ত আড়ম্বরপূর্ণ সাজগোজ তাঁকে মানায় না।" অন্যত্র বলেছিলেন, "ছেলেবেলায় একটি গভীর অর্থপূর্ণ বাক্য শুনেছিলাম—'অনাড়ম্বর জীবনযাপনের সাথে উচ্চচিন্তা'। তখন থেকেই এই ভাবনাটি আমায় পেয়ে বসে। এরপর যখন ঠাকুর ও মায়ের জীবন জানলাম, দেখলাম এই সত্যটি তাঁদের জীবনে কী সুন্দর ভাবেই না পরিস্ফুট! শ্রীমা আপাত গ্রাম্য মহিলা কিন্তু ভেতরে কি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। ঠাকুরের ক্ষেত্রেও তাই ; বাহ্যিক ভাবে গ্রাম্য কিন্তু অন্তরে অনন্ত ভাব।"

মহারাজ সাধারণতঃ ভাবসমাধি, দর্শন, এমনকি স্বপ্ন সম্পর্কেও বিশেষ আলোচনা করতেন না বা গুরুত্ব দিতেন না। কারও ভাব বা দর্শন হয় শুনলে রসিকতার সুরে বলতেন ডাক্তার দেখাতে। আর স্বপ্ন সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব না দিতে বলতেন। তথাপি তিনি মনে করতেন কতকগুলি স্বপ্ন কারও জীবন ও অদৃষ্টে ভাবী উন্নতির সূচনা ব্যক্ত করে। পূজনীয় মহারাজজীর জীবনে এ রকম কয়েকটি স্বপ্নের হদিশ অপ্রত্যাশিত ভাবে জানা যায়। তাদের মধ্যে তিনটির কথা মহারাজ স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মহারাজের লিপির ভাষান্তর নিম্নরূপ ঃ "অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী ঃ ২রা জুন ১৯৬৮, ভোর ৪.৩০-এ আমার একটি সুস্পষ্ট স্বপ্ন দর্শন হয়। জন কয়েক সন্ন্যাসী ভায়ের সাথে একটি আশ্রমে যাচ্ছি। সেখানে বিশেষ পূজার আয়োজন হয়েছে। দেখলাম পূজার উপকরণ, ফুল এবং নৈবেদ্য গোছানো রয়েছে এবং সাজানো হচ্ছে। অনেকগুলি (আলাদা) পূজার পাত্র ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ছবির সাথে একই প্যাণ্ডেলে ছিল। আমি একটি দলের সাথে মায়ের ছবিতে প্রণাম করতে গেলাম। যে মুহূর্তে প্রণাম করলাম, শ্রীশ্রীমা জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করে ছবি থেকে বেরিয়ে এলেন এবং আমাকে স্পর্শ করে কিছু পূজার পাত্র পরিষ্কার করতে বললেন যা তখনো পর্যন্ত অপরিষ্কৃত ছিল। তাঁর স্পর্শ আমার মধ্যে আনন্দের শিহরণ বইয়ে দিল ; অনুভব করলাম যে, আমার সামনে যিনি আছেন তিনি নিছক ছবি নন, মা—প্রেমময়ী জীবন্ত মা স্বয়ং। আহা! সে কি আনন্দ! আমি তাঁর কোলে মাথা রাখলাম, প্রণাম করলাম এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁর ভালবাসায় ভরা জীবন্ত রূপটি প্রতিদিন অন্তত একবার দেখবার জন্য যারপরনাই আবদার করলাম। তিনি সম্মতি দিলেন এবং অনির্বচনীয় ভালবাসা ও কোমলতার সঙ্গে আমাকে তাঁর বাহুতে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর গভীর আনন্দ ও আশীর্বাদপূত অনুভূতি নিয়ে আমি পূজার বাসন পরিষ্কার করতে গেলাম এবং খুব আনন্দে ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনাপূর্ণ হয়ে ঘরে রাখা গুরু মহারাজ ও রাজা মহারাজের ছবি দেখলাম। ঘড়িতে (দেখলাম) তখন ভোর ৪.৩৫। এটাই আমার শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে প্রথম স্বপ্ন। ১৯৫২ বা ১৯৬০ সালে যখন

শেষবার মায়াবতী এসেছিলাম তখন গুরু মহারাজের একটি স্বপ্ন পেয়ে ধন্য হই এবং আবার তা হয় ইন্‌স্টিটিউটে ১৯৬৩ সালে। লিপিবদ্ধ করলাম ঃ সময়—সকাল ১১.৩০, তারিখ ২.৬.৬৮।"

একজন ভক্ত একবার মহারাজকে বলেন, "সাধুজীবন যাপন করা খুবই কঠিন।" মহারাজ বললেন ঃ "হ্যাঁ, তা সত্যি। কৃপা—শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা দরকার, সাধুজীবন যাপনের জন্য।"

সম্প্রতি মহারাজ একদিন একটি অতি সাধারণ স্মরণিকায় প্রকাশিত শ্রীশ্রীসারদাদেবীর নিজের কথায় 'দক্ষিণেশ্বরে আমার দিনগুলি' শীর্ষক একটি রচনা পড়ছিলেন। পড়েই এত অভিভূত হলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে রচনাটির ২০ কপি জেরক্স করতে পাঠালেন এবং সেবককে নির্দেশ দিলেন সঙ্ঘের বিভিন্ন প্রকাশনা কেন্দ্রে একটি করে পাঠাতে, যাতে তারা রচনাটি স্থানীয় ভাষায় ভাষান্তর করে তাদের পত্রিকায় প্রকাশ করে।

২০০৩ সাল। মঠে দুর্গাপূজা চলছে। অষ্টমী পূজার সকালে পূজ্যপাদ মহারাজ সেবকদের বলছেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে যাবেন। সেবকরা তৈরি হওয়ার আগেই মহারাজ তৈরি হয়ে বসে আছেন। বেরোনোর জন্য মহারাজ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বেরিয়ে এগিয়ে চলেছেন। এমন সময় সেবক বলছে, "মা দুর্গার মণ্ডপে আগে প্রণাম করে আসবেন তো?" মহারাজ বললেন, "না, না, মণ্ডপে যাব না, ওখানে শুধুই মানুষের ভীড়। চল, মায়ের মন্দিরেই যাব। তিনিই আসল দুর্গা। মা-ই আমাদের আসল দুর্গা। তাঁর কাছেই চল।" মায়ের মন্দিরে গিয়ে মহারাজ প্রণামাদি সেরে প্রায় আধঘণ্টা চেয়ারে বসে অপলক নয়নে মাকে দেখছিলেন। সে দিনের সে পরিবেশের গাম্ভীর্য অবর্ণনীয়। মাকে অর্ঘ্য প্রদান করে আবার প্রণাম সেরে মহারাজ সোজা ঘরে ফিরলেন।

স্বামীজীর যেমন দৃঢ় প্রত্যয় ছিল সমাজের সর্বপ্রকার ব্যাধির একমাত্র প্রতিষেধ শিক্ষা, তেমনই পূজনীয় মহারাজ মনে করতেন বর্তমান এবং ভাবী সমাজের প্রতিটি সমস্যার সমাধান রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর মধ্যে।

সম্প্রতি মহারাজ বাংলাদেশে প্রকাশিত একটি বই পড়ছিলেন। বইটি পড়ে মানুষের দুঃখে মহারাজ খুব মর্মাহত হন ও দুদিন অন্তর্মুখ হয়ে সত্যি সত্যি চোখের জল ফেলেন। আশ্চর্য, মহারাজের মনে হল এ সমস্যার উত্তরও স্বামী বিবেকানন্দ। কারণ তিনি তাঁর সচিবকে নির্দেশ দেন স্বামীজীর রচনাবলীর কয়েকটি খণ্ড বাংলাদেশ সরকারের উচ্চপদাধিকারীদের কাছে পাঠাবার জন্য। মহারাজের বিশ্বাস, স্বামীজীর গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে চেতনার বিকাশ ও হৃদয়ের প্রকাশ অবশ্যই ঘটবে।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচারের প্রতি মহারাজের ছিল নিরলস আগ্রহ। বিভিন্ন কেন্দ্রের সাধুরা এলেই এ-ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেন। বিশেষ করে স্বামীজীর বই আরও বেশী করে বিক্রির বন্দোবস্ত করতে বলতেন।

তাঁর প্রত্যেক ভাষণে অব্যর্থভাবে মহারাজ উল্লেখ করতেন বিবেকানন্দ সাহিত্য কিভাবে আমাদের ব্যক্তিজীবনে এবং সমাজজীবনে পরিবর্তন আনতে সমর্থ। বক্তৃতা শেষে দেখা যেত বিবেকানন্দ সাহিত্য কেনার প্রতি মানুষের কী গভীর আকুতি।

সমগ্র জীবনে মহারাজ সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন বেদান্ত ও বিবেকানন্দের ভাবনার উপর। তিনি তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে বিশ্বাস করতেন জগতের সর্বপ্রকার ব্যাধির সত্যিকারের সমাধান রয়েছে বেদান্ত ও বিবেকানন্দের চিন্তায়। শুধু তাতে সমাধান আছে বলে মনে করতেন, তা নয়। সমস্যার সমাধানের উপায় হিসাবে তিনি সেই ভাবনাকে প্রয়োগ করেছেন এবং সফল হয়েছেন—এরকম ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত তাঁর বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করেছে।

আজীবন সঙ্ঘের প্রতি ছিল মহারাজের অপরিসীম ভালবাসা ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। অতি কৈশোরেই এই ভাবটি তাঁর মনে দানা বেঁধে ছিল। ১৯২৭ সালে তৎকালের এক প্রবীণ সন্ন্যাসী ব্যাঙ্গালোর থেকে পোনামপেট হয়ে মহীশূরে আসেন। সিদ্ধেশ্বরানন্দজী ও মহারাজ তাঁকে রেল স্টেশন থেকে আশ্রমে নিয়ে আসেন। পথে দুর্ভাগ্যজনকভাবে উক্ত সাধু বেলুড় মঠ সম্পর্কে একটি অপ্রীতিকর কটূক্তি করেন। সেদিন থেকেই তিনি তাঁর সম্পর্কে ছিলেন উদাসীন ও নীরব। যদিও উক্ত সাধুকে পরবর্তী কালে সঙ্ঘ ত্যাগ করতে হয়।

পরবর্তী কালেও যখনই কেউ সঙ্ঘকে কোন দিক থেকে ছোট বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার মনোভাব দেখিয়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ দৃঢ়স্বরে যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে প্রমাণ করতেন যে পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম মহান সঙ্ঘ আর কখনো হয়নি এবং ভবিষ্যতেও সমগ্র পৃথিবীর জন্য আমাদের সঙ্ঘ অবিস্মরণীয় কীর্তি এবং অবদান রাখবে। সেজন্যই সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারীদের সর্বদাই ঠাকুর-মা-স্বামীজীর যোগ্য উত্তরাধিকারিস্বরূপ জীবন গঠন করতে নির্দেশ দিতেন।

১৯৬৪ সালে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকীর পূর্তি অনুষ্ঠানে বেলুড় মঠে লেগেট হাউসের দক্ষিণে গঙ্গার নিকটে সহাধ্যক্ষ স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে প্রবীণ সন্ন্যাসীরা যেখানে বক্তৃতা করছিলেন, সেখানে কম বয়স্ক সুবক্তা স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী পাঁচ মিনিটের সীমিত বক্তৃতায় বাইবেলের সেই ঘটনার উদ্ধৃতি দেন যেখানে জন্ম থেকে পঙ্গু একটি লোক পিটার ও জন মন্দিরে প্রবেশ করার সময় তাঁদের কাছে ভিক্ষা চায়। ডান হাত ধরে পিটার তাকে দাঁড় করিয়ে দেন এবং সেই পঙ্গুটির পঙ্গুত্ব তখনই সেরে যায় ও চলাফেরা ও ছোটাছুটি করতে থাকে। মহারাজ এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন যে, "আমাদের সব সন্ন্যাসীকে এরকম আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন হতে হবে—স্বামীজী আমাদের কাছে এই চান।"

মহারাজ বলতেন, "ঠাকুরের মিশন চরিতার্থ করাই আমার একমাত্র মিশন। তাই ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন আলাদা মিশন নেই। আমাদের সকলকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে ঠাকুরের একটি মিশন ছিল এবং আমরা এখানে আছি সেই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য ; আমরা যেন তাঁর মিশন রূপায়ণ করার যোগ্য হয়ে উঠতে পারি।"

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মহারাজ ছিলেন সন্ন্যাসের কঠোর কঠিন আদর্শস্থাপনে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও তৎপর। কখনো বলতেন, "অন্যকে খুশি করতে সন্ন্যাসীর আদর্শবিরোধী সামান্যতম পদক্ষেপও তার বিপদ টেনে আনবে।" কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ এবং এসবের প্রতি তাঁর উচ্চতম দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও লোকব্যবহারে তিনি ছিলেন দৃঢ় ও অনমনীয়।

সাম্প্রতিক একটি ঘটনা। বেলুড় মঠে অসময়ে একটি পরিবারের স্বামী, স্ত্রী ও তাদের ছেলে মহারাজের ঘরে এসে প্রণাম করতে চাইলে মহারাজ তাঁর সচিবকে বললেন, "আমি তো কোনদিন আমার ঘরে কোন মায়ের প্রণাম নিইনি। এখন কী হবে?" তারপরেই বলছেন, "আচ্ছা, তোমরা থাক, তোমরা যখন আমার কাছে আছ ওদের সবাইকে নিয়ে এসে প্রণাম করিয়ে নিয়ে যাও।" সকলে স্তম্ভিত।

টাকা-কড়ির ব্যাপারে মহারাজ ছিলেন উদারহস্ত। বিভিন্ন জায়গায় বহু প্রকল্পের কাজে টাকা পাঠাতেন। এমনকি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হয়তো আমাদের সঙ্ঘের আদর্শগত খুব সাদৃশ্য নেই তারাও মহারাজের সাহায্য পেত। কেউ আপত্তি করলে মহারাজ বলতেন, "তোমরাই বুঝি শুধু ভাল কাজ করছ? অন্য কেউ করে না?"

পৃথিবীর যখন যেখানে গেছেন, আক্ষরিক ভাবে তিনি কপর্দকহীন ভাবে গেছেন। কোনদিন কোন পয়সাকড়ি সঙ্গে রাখেননি। হল্যাণ্ডে এক বিমানবন্দরে পৌঁছে বসে আছেন। তাঁকে নিতে তখনও কেউ আসেনি। তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য একটা ফোন করার দরকার হয়। তিনি নির্দ্বিধায় একজনের কাছে ৫০ সেণ্ট চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অন্য এক সহৃদয় মহিলার কাছ থেকে সেটি পেয়ে ফোন করেছিলেন। এমনই ছিল তাঁর নিরভিমানিতা।

মহারাজ তখন হায়দ্রাবাদে। কত ভক্ত কত কিছুই দিয়ে যায়। ২/৩ দিনের মধ্যেই সব বিলি হয়ে যায়। এরকম একবার অনেক জিনিসের মধ্যে খুব সুন্দর একটা ব্যাগ এসেছে। মহারাজের ঘোরাঘুরির কাজে উপযুক্ত মনে করে মহারাজের সচিব সেটাকে সরিয়ে রাখে। ব্যাপারটি মহারাজের নজরে আসতেই মহারাজ ঐ ব্যাগটির কথা জিজ্ঞাসা করেন ও তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বলেন। ব্যাগটি নিয়ে এসে সচিব পুনরায় ব্যাগটির উপযোগিতা বলতে উদ্যোগী হলে মহারাজ তাকে থামিয়ে বহুদিনের পুরানো ব্যাগটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন, "This fellow (অর্থাৎ ব্যাগটি) গত ২০ বছর আমার সঙ্গে ঘুরেছে। আজ ওকে কিভাবে ত্যাগ করি?" মহারাজের কথা শুনে সলজ্জ সেবকেরা অধোবদন হয়ে যায়। এবার ঘরের কোণে রাখা নতুন ব্যাগটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখা যাক, এই ব্যাগটি কার?" দু-একদিনের মধ্যে নতুন ব্যাগটি অন্য কাউকে দিয়ে দিলেন।

অনাসক্তি ছিল তাঁর জীবনে শ্বাস প্রশ্বাসের মতো স্বাভাবিক। একবার অরুণাচল প্রদেশ থেকে একজন দীক্ষিত ভক্ত খুব দামী একখানি কম্বল এনে মহারাজকে দিলেন। এর কিছু পরেই কাশ্মীরের একজন ভক্ত এসেছেন। তাঁর কাছে কাশ্মীরী পণ্ডিতদের দুরবস্থার কথা শুনে মহারাজ তৎক্ষণাৎ সদ্যপ্রাপ্ত কম্বলখানি তার হাতে দিয়ে দিলেন দুর্গত মানুষদের জন্য।

মহারাজ তাঁর সেবকদের বার বার বলে দিতেন তাঁরা নাম করে বা তাঁর প্রয়োজনের কথা বলে ভক্তদের কাছে কিছু না চাইতে। তিনি খুব সাদাসিধে ছিলেন। পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য জিনিসপত্র তিনি একেবারে ফেলে দেওয়ার আগে পর্যন্ত ব্যবহার করতেন।

সাধুজীবনে আত্মতৃপ্তিকে মহারাজ অন্যতম শত্রু বলে মনে করতেন। বলতেন, "আমাদের এক আনা সাধুত্বের সঙ্গে ভক্তেরা বাকী পনের আনা মিশিয়ে ষোল আনা ভক্তি প্রদর্শন করে। আমাদের মনে রাখতে হবে লক্ষ্য এখনো অনেক দূর।"

মিতব্যয়িতা ছিল মহারাজের দ্বিতীয় স্বভাব। একবার তাঁরই সেবক কোথায় যাবে, ট্রেনের টিকিটের সঙ্গে কিছু টাকা আছে কিনা মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন। 'কিছু আছে' বলাতে মহারাজ বললেন, "টাকার অপব্যয় করবে না। এগুলো লোকেদের দেওয়া টাকা। আমরা মানুষের কাছে দায়বদ্ধ।" সামান্য জিনিসও মহারাজ অপচয় করা পছন্দ করতেন না। টুথপেস্ট শেষ হবার মুখে, তা পেপার ওয়েট দিয়ে ঠেসে ঠেসে বের করে শেষ কণা পর্যন্ত ব্যবহার করতেন। মিটিং থেকে উঠে আসার সময় এজেণ্ডা লেখা কাগজটিও তুলে আনতেন, প্যাডের কাছে রাখতেন—উল্টোদিকে কিছু লেখা যাবে বলে।

সাধুদের লোকব্যবহার সম্পর্কেও মহারাজ খুব নজর রাখতেন। কারও প্রতি দুর্ব্যবহার, কটূক্তি করা বা আঘাত করা মহারাজ মেনে নিতে পারতেন না। একদিন প্রণামের সময় হয়তো বা প্রয়োজনের তাগিদে এক সেবককে একটু উঁচু সুরেই কথা বলতে হয়। মহারাজ বিষয়টি লক্ষ্য করলেন। শুধু তাঁর বাঁ হাতটা তার দিকে সামান্য ওঠালেন। তাতেই সেবক বুঝতে পেরে চুপ করে গেল। পরে ভক্তরা চলে গেলে মহারাজ বললেন, "দেখ, ভক্তরা কত দূর-দূরান্ত থেকে গভীর ভালবাসা ও আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে এখানে আসে। আমরা তাদের কাছে যেন পুলিসের ভূমিকা গ্রহণ না করি।"

মহারাজ বলতেন, "সন্ন্যাসীর মনটি সদা সতর্ক থাকবে। সতর্কতাই স্বাধীনতা ও উচ্চ আধ্যাত্মিক উন্নতির রক্ষক।" এ প্রসঙ্গে বিবেকচূড়ামণি থেকে একটি শ্লোক প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন—

লক্ষ্যচ্যুতং চেদ্‌যদি চিত্তমীষদ্‌বহির্মুখং সন্নিপতেৎ ততস্ততঃ।

প্রমাদতঃ প্রচ্যুতকেলিকন্দুকঃ সোপানপঙ্‌ক্তৌ পতিতো যথা তথা ॥ (৩২৫)

অর্থাৎ—খেলার গোলক খেলোয়াড়ের হাত থেকে হঠাৎ অসাবধানতাবশতঃ সিঁড়িতে পড়লে যেমন ক্রমশঃ নীচের দিকে গড়িয়ে যায়, সেই রূপ চিত্ত যদি প্রমাদবশতঃ লক্ষ্য ব্রহ্ম থেকে ঈষৎ চ্যুত হয়ে বহির্মুখ হয় তাহলে সেই চিত্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও বিষয় প্রভৃতিতে গমন করে।

তিনি সাধুদের ভাণ্ডারা ইত্যাদির জন্য কখনোই একটি পয়সাও খরচ করতে রাজি হতেন না। তাঁর কাছে সাধুদের খেলাধুলা ও পড়াশুনা ব্যতীত অন্য কোন বিনোদনের প্রশ্রয় একেবারেই ছিল না। টেলিভিশনের প্রয়োজনীতা একদিনের জন্যও অনুভব করেননি। মাঝে মধ্যে হায়দ্রাবাদ মঠে এক প্রবীণ মহারাজ বিশেষ ঘটনাবহুল দিনে নিজের রেডিওটি নিয়ে গিয়ে মহারাজকে সংবাদ শুনিয়ে আসতেন।

সাধুদের কাজ বাড়ানোর বাতিককে মহারাজ একেবারেই উৎসাহ দিতেন না। আবার অলস, অকর্মণ্য ভাব দেখলে অত্যন্ত বিরক্ত হতেন। যাদের আশ্রমের কাজ করেও সময় থাকত, তাদের পড়াশুনা ও জপধ্যান বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলতেন।

সাধু-ব্রহ্মচারীদের পক্ষে সামান্য শারীরিক স্পর্শাদি মারাত্মক ও ক্ষতিকারক বলে সর্বদা সতর্ক করে দিতেন। এই প্রসঙ্গে মহারাজের কণ্ঠে বহুবার শোনা যেত বিবেকচূড়ামণির

বিখ্যাত এই শ্লোকটি ঃ

শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ পঞ্চত্বমাপুঃ স্বগুণেন বদ্ধাঃ।

কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-মীন-ভৃঙ্গা নরঃ পঞ্চাভিরঞ্চিতঃ কিম্ ॥ (৭৮)

অর্থাৎ—হরিণ, হাতী, পতঙ্গ, মাছ, ভ্রমর—এই পাঁচ প্রাণীর এক একটি শব্দাদি পঞ্চবিষয়ের (রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ) এক একটি দ্বারা বদ্ধ হয়ে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, মানুষ তো পাঁচটি বিষয়ে আসক্ত, সে কি অনিষ্টপ্রাপ্ত হবে না—অবশ্যই হবে। মহারাজ পঞ্চ বিষয়ের মধ্যে স্পর্শকে অধিকতর শক্তিশালী বলে বর্ণনা করতেন।

তারই সঙ্গে আত্মা যে স্পর্শাদিশূন্য নিত্য অক্ষয় ও অব্যয় এবং তা যে আত্মস্বরূপ সেটি স্মরণ করিয়ে কঠোপনিষদের এই শ্লোকটি আবৃত্তি করতেন ঃ

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ (১/৩/১৫)

অর্থাৎ—যিনি শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধবিহীন, যিনি অক্ষয় শাশ্বত অনাদি ও অনন্ত, যিনি মহৎ হতে বিলক্ষণ ও কূটস্থ, তাঁকে অবগত হলেই সাধক মৃত্যুমুখ হতে বিমুক্ত হন।

মহারাজের জীবনের অন্যতম ভূষণ নিরহঙ্কারিতা। ১৯৭২ সালের একটি ঘটনা। মহারাজ গিয়েছেন কনখলে। একজন সন্ন্যাসী, পূজনীয় মহারাজকে খুব কাছে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "মহারাজ, অনেকে বলেন, আপনার দেশে-বিদেশে এত সুনাম হয়েছে যে, আপনি নিজেই নাকি একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছেন। এই কথা যদি সত্যি ধরে নিই তাহলে এখন আপনার জীবনে সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা বা তাৎপর্য কোথায়?" মহারাজ শুয়েছিলেন। কথাটি শুনেই ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসলেন। বিস্ময়ের সুরে বললেন, "রামকৃষ্ণ মিশন ব্যতীত রঙ্গনাথানন্দের পৃথক অস্তিত্ব কোথায়? জানবে, সঙ্ঘ ব্যতীত আমার মূল্য একেবারে শূন্য।"

হায়দ্রাবাদ থেকে বেলুড় মঠে এসে কখনো বলেছেন, "যখনই আমি বেলুড় মঠে আসি, তখনই নিজেকে কেমন জানি নবাগত ব্রহ্মচারীদের একজন বলে মনে হয়।"

কত ভক্তই যে দেশ-বিদেশ থেকে তাঁর কাছে আসতেন তার ইয়ত্তা নেই। শুধু ভক্ত নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁর কাছে কিছু সময় পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে থাকতেন। অনেকে হয়তো ভক্ত নন, তাঁরা ঠাকুরের মন্দির বা মঠে যেতেন না। শুধু মহারাজের সাথে দেখা করেই হয়তো চলে যেতেন। এ প্রসঙ্গে একদিন মহারাজের কাছে থাকা এক সেবককে বলছেন, "দেখ, তোমরা ভেব না তোমার আমার কাছে আসে ; তারা সব ঠাকুরের কাছেই আসে।"

নিরভিমানিতা সম্পর্কে মহারাজ ভাগবত থেকে একটি শ্লোক মাঝে মাঝেই বলতেন। একবার ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সেই শ্লোকটিকে বিষয় করে এক ঘণ্টার একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। শ্লোকটি হল ঃ

জন্ম কর্মবয়োরূপ-বিদ্যৈশ্বর্য্যধনাদিভিঃ।

যদ্যস্য ন ভবেৎ স্তম্ভস্তত্রায়ং মদনুগ্রহঃ ॥ (৮.২২.২৬)

অর্থাৎ—যদি জন্ম, কর্ম, বয়স, রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য ও ধনাদি দ্বারা সেই পুরুষের স্তম্ভ (গর্ব) না জন্মে, তাতেই আমার অনুগ্রহ।

কৈশোর থেকেই মহারাজ গীতা, উপনিষদ, বিবেকচূড়ামণি ইত্যাদি মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। বলতেন, "একটি উচ্চজীবন যাপন করা এবং ভাবপ্রচার করা—এটিই আমাদের দায়িত্ব। এটাই আমাকে পড়তে এবং মুখস্থ করতে আগ্রহ যুগিয়েছে।" অন্যত্র বলেছেন, "স্বামীজীর বাণী ও রচনার অনেকগুলি ভাষণ অন্তত কুড়ি বার পড়েছি। 'মদীয় আচার্যদেব' পড়েছি পঁচিশবার, 'ভারতের ভবিষ্যৎ' ত্রিশ বার। এভাবে পড়লেই শুধু স্বামীজীর ভাবনাগুলি ধারণা করা যায়।"

সাধু-ব্রহ্মচারীদের সর্বদাই পড়াশোনায় উৎসাহ দিতেন। ব্রহ্মচারীদের মধ্যে যাদের গীতা মুখস্থ হয়ে যেত তাদের তিনি স্বামীজীর বাণী ও রচনা উপহার দিতেন।

মাঝে মাঝেই মহারাজকে বলতে শোনা যেত, "Knowledge will prevail. Go to knowledge." গীতা থেকে কতবার-ই এই শ্লোক বলতেন,

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতামদ্ভাবমাগতাঃ ॥ (৪.১০)

অর্থাৎ—বিষয়াসক্তি ভয় ও ক্রোধ বর্জিত, আমাতে একাগ্রচিত্ত এবং আমার শরণাগত বহু ব্যক্তি জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে আমার স্বরূপ লাভ করেছেন।

মহারাজের বই পড়ার স্বভাব শেষদিন পর্যন্ত ছিল। এমন কি অসুস্থতার মধ্যেও তার ছেদ পড়ত না। ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে মহারাজ যখন অসুস্থ, শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'Swadeshi Movement in Bengal and Freedom Struggle of India'—গ্রন্থটি মহারাজের জন্য দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল সুস্থ হয়ে মহারাজ বইটি পড়বেন। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাতেই মহারাজের সচিবের অপ্রত্যাশিত ফোন পেলেন শঙ্করীবাবু। তিনি অবাক হয়ে শুনলেন, ইতিমধ্যেই মহারাজ সারাদিন ধরে বইটি পড়ে প্রায় শেষ করে এনেছেন এবং মন্তব্য করেছেন, "বইটি আমার খুব ভাল লাগছে।"

মহারাজ সারাজীবন কতই না বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর ভাষণের প্রশংসা কত জনেই না কত দিক থেকে করেছেন। তখন ১৯৪৬ সাল। সেবারে মঠে সাধু সম্মেলনে এসেছেন করাচি থেকে। শ্রীশ্রীঠাকুরের আরাত্রিক ভজনের বিখ্যাত কথা—'সম্পদ তব শ্রীপদ ভব-গোষ্পদ-বারি যথায়'—এই বাণীটির উপর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেটি শুনে স্বামী দয়ানন্দজী তাঁর হাত দুটি ধরে মন্তব্য করেছিলেন, "শঙ্কর, তুমি শুধু ভাল ইংরেজি বলনি, তুমি শুদ্ধ ইংরেজিতেও বলেছ।" মহারাজ বলেছিলেন, "এর আগে আমি ভাল ইংরেজি এবং শুদ্ধ ইংরেজি—এ-দুটির পার্থক্য জানতাম না। সেই প্রথম এরকম মন্তব্য শুনি।"

একজন প্রবীণ বিদগ্ধ সন্ন্যাসী পূজনীয় মহারাজের বক্তৃতা সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, যেমন তিনি মহারাজের ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ধরে দীর্ঘ সুললিত ভাষণ শুনে চমৎকৃত হয়েছেন, তেমনি আবার ওয়ার্ধাতে গান্ধীজীর আশ্রমে মাত্র ৫ মিনিটের ভাষণ শুনে মন্ত্রমুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছেন এই ভেবে যে, মাত্র ৫ মিনিটের মধ্যে নিটোল ও যথাযথরূপে একটি বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা কিভাবে সম্ভব!

মহারাজের সময় ব্যবহার ছিল দেখবার মতো। দিনচর্যার একটি পর্ব শেষ না হতেই মহারাজ পরবর্তী পর্বে কি কি করণীয় জিজ্ঞাসা করতেন। সেইভাবে সময়কে নিখুঁতভাবে

ব্যবহার করে চলাই ছিল তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। নিজেও এক সময় বলেছেন, "অনেকে বলে সময় পাই না, আমি তো সঙ্ঘে যোগ দেবার পর থেকেই প্রচুর কাজ করেছি, অনেক পড়েছি, অনেক লিখেছি, বহু জায়গায় ঘুরেছি, জপ-ধ্যানে ফাঁকি দিইনি, বহুক্ষণ খেলেছি, এরপরেও আড্ডার জন্য যথেষ্ট সময় থাকত—তারও সদ্ব্যবহার করেছি।" স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলতেন, "শঙ্কর মহারাজকে বসে, শুয়ে, এমনকি গাড়িতে যেতে যেতেও বই পড়তে দেখেছি ; যখনই দেখেছি, তখনই তিনি বই পড়ছেন।"

আপাতদৃষ্টে মনে হতো মহারাজের বাইরে জ্ঞানের ভাব কিন্তু অন্তরঙ্গভাবে যাঁরা তাঁকে পেয়েছেন, তাঁরা লক্ষ্য করেছেন মহারাজের অন্তরটা ছিল ভক্তিপূর্ণও বটে।

একবার মহারাজ নরেন্দ্রপুরে কিছুদিনের জন্য গিয়ে রয়েছেন। আশ্রমের একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ সন্ন্যাসী দেবী স্তোত্রাদি গেয়ে শোনাচ্ছিলেন। মহারাজ আসনে স্থির হয়ে বসে সে গান শুনছিলেন। লক্ষ্য করা গেল মহারাজের দু-চোখের কোণ থেকে পড়ছে অশ্রুধারা।

স্বামীজীর ভাবের যোগ্য অধিকারী পূজনীয় মহারাজ বিশ্বাস করতেন, শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে এবারে ভারতবর্ষের মেয়েরা উঠবে। তাই মেয়েদের দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা-ব্যর্থতা তাঁর হৃদয়কে তীব্রভাবে আলোড়িত করত।

মহারাষ্ট্রের ভূ-কম্প পীড়িতদের জন্য যখন মিশনের পক্ষ থেকে বাড়ি তৈরী করে দেওয়া হচ্ছিল, তখন মহারাজ বিশেষভাবে আগ্রহ করেছিলেন যে প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গে যেন একটি করে শৌচাগার থাকে। কেউ কেউ এতে আপত্তি জানালে তিনি বলতেন, রাত-বিরেতে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে শীতকালে বা বর্ষাকালে কোনো মা'কে বা বোনকে ঘরের বাইরে শৌচে যেতে হচ্ছে ভাবলেও তাঁর বড় কষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমার শৌচে যাওয়ার কষ্টের কথা তাঁকে সারাজীবন ভাবিয়েছে।

মহারাজ যখন যেখানে ছিলেন, তখনই শ্রীসারদা মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীরা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে সমান্তরালভাবে মহারাজের স্নেহ-ভালবাসা-কল্যাণস্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছেন। তাঁদের বিভিন্ন আশ্রমের খবরাদি ছিল তাঁর নখদর্পণে। তাঁরাও যথারীতি মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন, উপদেশ প্রার্থনা করতেন এমনকি তাঁদের বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক সাহায্যও মহারাজ করেছেন। যুবতী ভক্ত মেয়েদের বার বার শ্রীমায়ের ও স্বামীজীর জীবন ভাল করে পড়ে তা জীবনে অনুশীলন করতে বলতেন। কত শিক্ষিতা মেয়েকে ত্যাগের পথে উৎসাহ দিয়ে শ্রীসারদা মঠে প্রেরণ করেছেন। একবার দু-বোন এসে জানায়, তাদের ইচ্ছা নয় বিয়ে করা। শুনে মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, "খুব ভালো, তোমাদের জীবনের অর্ধেক সমস্যাই মিটে গেল।"

মায়েদের দুঃখ দুর্দশার সংবাদ পেলে মহারাজ গভীরভাবে ব্যথিত হতেন। প্রয়োজনমত উপদেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হতেন না। দরকারবিশেষে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছেন—এরকম বহু দৃষ্টান্ত তার ঘনিষ্ঠজনদের জানা।

একবার মহারাজের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ও একটি চিঠি নিয়ে মাদ্রাজ মঠের একজন সাধু ঠিকানা খোঁজ করে প্রাপককে বার করে। দেখা গেল প্রাপক আর কেউ নয়—বস্তি অঞ্চলের হত দরিদ্র এক রমণী। পরে মহারাজের পাঠানো চিঠিটি হাতে করে

এই সাধারণ মহিলাটি কয়েকবার এসেছেন সুদূর মাদ্রাজ থেকে হায়দ্রাবাদ! উল্লেখ্য, যখনই মহারাজের কাছে কেউ সাহায্যের আবেদন করেছেন, তিনি কখনোই সেই ব্যক্তির ও তার প্রয়োজনটির সম্বন্ধে সন্দেহ করেননি। এতে মহারাজকে জীবনে ঠকতেও হয়েছে প্রচুর।

চিরদিন মহারাজের মধ্যে সেবার ভাব ছিল প্রবল। যখন যেখানে যতটুকু সেবার সুযোগ পেয়েছেন, তা পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার করেছেন।

১৯৫৬ সালে অক্টোবর মাসে মহারাজ গেছেন সিডনি। Marie Byles—এক প্রগতিবাদী নারী নিউ সাউথ ওয়েলসে চেল্‌থেনহামে তাঁর বাড়িতে মহারাজকে নিয়ে যান। বাড়িতে পৌঁছে মহারাজকে বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করে নিজে আহার প্রস্তুত করতে উদ্যোগী হন এবং মহারাজের সাথে পরিচিত হবার জন্য কয়েকজনকে আমন্ত্রণ করেন। মহারাজ বলেন যে, তিনি বিশ্রাম নেবেন আর সেসময় তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ একজন ভদ্রমহিলা তাঁদের জন্য খাবার প্রস্তুত করবেন, এমনটি হতে পারে না। এর উত্তরে ভদ্রমহিলা বলেন, হিন্দু প্রথা অনুযায়ী 'অতিথি নারায়ণ' এবং তাঁকে সম্মান দেওয়ার ও সেবা করা গৃহস্থের কর্তব্য। মহারাজ প্রত্যুত্তরে বলেন, "অন্য অতিথিদের জন্য এ নিয়ম ঠিক আছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগীদের ক্ষেত্রে এটি খাটে না। তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) মানুষকে সেবার মাধ্যমে আনন্দ পেতে শিখিয়েছেন।" ভদ্রমহিলা জানান যে, তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা কার্য সম্পর্কে অবহিত আছেন। এরপর মহারাজ প্রায় জোর করেই তাঁর সম্মতি নিয়ে রান্না ঘরে প্রবেশ করেন এবং তাঁদের জন্য খাবার প্রস্তুত করেন, যার মধ্যে তরকারি এবং পায়েসও ছিল।

সামান্যভাবেও মহারাজ মানুষকে সেবা করে শান্তি দিয়ে চাইতেন। অনুরোধ যেরকমই হোক না কেন, পারতপক্ষে মহারাজ কাউকে বিমুখ করতেন না। তাই সাধারণ ভক্তরা পর্যন্ত মহারাজের কাছে এসে মুগ্ধ ও তৃপ্ত হয়ে ফিরত। একটি ঘটনা—একদিন এক মহিলা ভক্ত তাঁর শিশুর জন্য একজন প্রাচীন সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করেছিলেন তার মুখে ঠাকুরের প্রসাদ দিতে। উক্ত সন্ন্যাসী তাঁদের মহারাজের সচিবের কাছে পাঠিয়ে দেন। সচিব পূজনীয় মহারাজকে বিষয়টি বললে, মহারাজ শুধু শিশুটির মুখে প্রসাদ দিলেন তা নয় ; সেবককে ডেকে সেই মুহূর্তের একটি ছবিও তুলে রাখতে বললেন। সেদিন সে ভক্ত কি অপরিসীম আনন্দ পেয়েই না ফিরেছিল!

জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ তাঁকে ভালবাসতেন। তিনি তাঁদের কাছে যেতেন। মুসলমানরাও তাঁর কাছে থেকে দীক্ষা নিয়েছেন। বহু মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন সারা জীবনে। কিন্তু এই পরিচিতিকে কখনোই তিনি ব্যক্তিগত সম্পর্ক বলে মনে করতেন না।

হৃদয় ও মস্তিষ্কের অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছিল মহারাজের মধ্যে। যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা ছিল তাঁর স্বভাবজাত। তাই যুক্তিযুক্ত পরামর্শ হলে ছোটবড় সকলের কথাই সমান গুরুত্ব দিয়ে শুনতেন। জ্ঞানের প্রতি তাঁর স্পৃহা কখনোই তাঁকে সাধারণ মানুষের দুঃখ অনুভব করা এবং তার প্রতিকার করার ইচ্ছা থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। কোন ভক্ত যদি কোন দুঃখের কথা বলতেন তাহলে সেই দুঃখের কাহিনী এবং কিভাবে সেটির প্রতিকার করা যাবে এই চিন্তা তাঁর হৃদয়ে এতটাই গেঁথে যেত যে তিনি বিশ্রামও নিতে পারতেন না। "মহারাজ

একটু বিশ্রাম নিন।" —এই অনুরোধ করলে বলতেন, "My head is full of country's problems."

মহারাজ মানুষের যতটুকু দুঃখ দূর করার চেষ্টা করতেন, তার সঙ্গে সঙ্গে জোর দিতেন, তারা যেন নিজেরাই নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং নিজের সমস্যার সমাধান করতে পারে। সাময়িক প্রতিকারের থেকেও মহারাজ চাইতেন দেশের জনসাধারণ জানুক যে তারা শুধু ভোটদাতা নয়। তাদের চেতনা প্রবুদ্ধ হলে, দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন হলে, গণতান্ত্রিক দেশে মানুষ সঠিকভাবে দেশ গঠনে তার ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই দেখা গেছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত সকলকেই তিনি প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন এবং দেশের উন্নয়নে প্রত্যেকের কিছু অবদান থাকুক—এটিই আশা করতেন।

তাঁর জীবনের অন্যতম বিশেষত্ব ছিল সব কিছুর এবং সকলের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখা। কখনোই তাঁকে কারো নিন্দা সমালোচনা করতে শোনা যায়নি। কাউকে কখনো ছোটো করে ভাবতে পারতেন না। সর্বদাই সকলকে উৎসাহ দিয়েছেন।

জীবনের যে কোন মাত্রিক ঘটনাকে মেনে নেওয়ার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল মহারাজের। মনটাকে এতই গুটিয়ে নিতে পারতেন যে বাহ্যিক কোন সুবিধা-অসুবিধা মনের উপরে প্রভাব ফেলতে পারত না।

একবার হায়দ্রাবাদ ফিরে যাবেন। কলকাতা বিমানবন্দরে গিয়ে শুনলেন, বিমান কয়েক ঘন্টা বিলম্বে ছাড়বে। বিমানবন্দরের কাছেই কাঁকুড়গাছি আশ্রম। বেলুড় মঠ থেকে খবর পেয়ে মহারাজকে সেখানে গিয়ে বিশ্রাম করার জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি কাঁকুড়গাছি না গিয়ে চারঘণ্টার উপর সময় বিমানবন্দরের লাউঞ্জের সোফাতে বসেই দিব্যি কাটিয়ে দিলেন।

আর একবার, হায়দ্রাবাদ থেকে বেলুড় মঠে আসছেন। বিমানবন্দর থেকে ট্যাক্সি ধরে সোজা বেলুড় মঠ। এলে কি হবে, তখন মাঝরাত। সদর দরজা বন্ধ। তখন নৈশ প্রহরীর ব্যবস্থাও ছিল না। বহুক্ষণ মহারাজ দরজায় শব্দ করে এবং অনেক ডাকাডাকি করেও মঠে ঢুকতে পারলেন না। অবশেষে মঠের পাশেই সারদাপীঠের গেটে গিয়ে ওদের দরজা খোলাতে পারলেন। রাতটা ওখানেই কাটালেন। আশ্চর্যের বিষয়, পরদিন যখন তিনি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মহারাজ ভূতেশানন্দজীকে আগের রাত্রের ঘটনা রসিকতার সুরে বর্ণনা করছেন, তখন মনে হচ্ছে যেন ঘটনাটি অন্য কারো জীবনে ঘটেছে। এভাবে পর্যুদস্ত হয়েও কোনরকম প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি।

মহারাজের একটি বৈশিষ্ট্য কারো নজর না কেড়ে পারেনি। তা হল—যে কোন স্তরের মানুষকে যথোচিত মর্যাদাদান। যে কেউ যে কোনো সময়ে মহারাজের কাছে একবার পৌঁছতে পারলে তার জন্য অপেক্ষা করত একটি মৃদু হার্দিক অভ্যর্থনা। স্বল্প সময়ের জন্য হলেও একটি-দুটি কথা মহারাজ অবশ্যই তার সাথে বলতেন। তারা খুশী হয়ে ফিরে যেত। লক্ষ্য করা গেছে, জপ-ধ্যান, পড়াশোনা, যে অবস্থাতেই মহারাজ থাকুননা কেন, কেউ এলেই তিনি সেই কাজটির থেকে তার সাথে দেখা করাটাকেই অধিকতর গুরুত্ব দিতেন।

সে ব্যাপারে উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, পরিচিত-অপরিচিত সকলকেই একইরকম ভাবে আপ্যায়ন করতেন।

মহারাজ বার্মায় থাকাকালে পোষ্ট-অফিসের যে-পিওন মঠে চিঠি দিতে আসতেন, গরমকালে মহারাজ তাঁকে দরদর করে ঘামতে দেখে সোফায় বসে একগ্লাস জল খেতে বলতেন। তিনি সোফায় না বসে মেঝেতে বসে জল খেতেন, কারণ তাঁরা ওরকম শিক্ষাই পেয়ে এসেছেন। কিন্তু মহারাজ জোর করে তাঁকে একরকম কোলে করে সোফায় বসিয়ে জল খাইয়ে ঠাণ্ডা হতেন।

মহারাজের রসবোধ মনের নীচ দিয়ে যেন ফল্গুধারার মত বয়ে যেত। কখনো কখনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটত।

একবার মহারাজের কানে এক সমস্যা হয়। E. N. T. বিশেষজ্ঞ সিরিঞ্জ দিয়ে কানের ভিতরটা পরিষ্কার করেন এবং জানতে চাইলেন, "মহারাজ, শোঁ শোঁ শব্দটা কি এখনো হচ্ছে?" মহারাজ বলে উঠলেন, "No, the child is crying no more."

তাঁর নিজের বলা একটি ঘটনা। মহীশূর থাকাকালীন তাঁর একবার ইচ্ছা হয় পরিব্রাজক রূপে বেড়িয়ে পড়ার। মোহন্ত মহারাজের অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। একবার সারা দিন ঘুরেছেন, কিছু খাওয়া হয়নি। গভীর রাতে পৌঁছেছেন মহীশূরের কাছে ছোট্ট একটি শহরে। দেখা হয়ে গেল অনেক কাল আগে পরিচিত এক ভক্তের সাথে। তাঁদেরই বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন আনন্দে। কিন্তু লক্ষ্য করলেন—ভক্তটির বাড়ীতে জায়গা অল্প। তাই তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটা স্কুল বাড়ীর বারান্দায় এসে শুয়ে পড়লেন। সকালে উঠে দেখেন এক অদ্ভুত দৃশ্য ঃ রাস্তার কুকুর, গরু ছাগল সব তাঁর আশে-পাশে শুয়ে আছে। এই ঘটনাটি বলে মহারাজ হাসতে হাসতে বলতেন, "ওটা আমার অবধূত অবস্থা গেছে।"

মহারাজের পেট ভাল যেত না। তাই খাওয়া-দাওয়ার প্রতি সব সময় ছিল একটা অনীহা। এত অল্প খেয়ে এত উচ্চ চিন্তা কিভাবে করেন জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, "আমার হিমাচল প্রদেশটা শক্ত কিন্তু মধ্যপ্রদেশটা দুর্বল।"

চিরদিনই মহারাজ ছিলেন স্বাবলম্বী। সঙ্ঘের সহাধ্যক্ষ হওয়ার পরেও দীক্ষাদির ব্যাপার ছাড়া সেবকদের নিজের ব্যক্তিগত কাজ কিছুতেই করতে দিতেন না। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা এবং স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। কেউ কোথাও অপরিহার্য নয় এটাই ছিল তাঁর বিশ্বাস। এমনকি হায়দ্রাবাদ মঠে পূজারীর অনুপস্থিতিতে তিনি নিজে আরতিও করেছেন।

কঠোর পরিশ্রম করা ছিল মহারাজের ধাত। বছরের পর বছর লেখাপড়া করতে করতে বইয়ের ভাললাগা এবং প্রয়োজনীয় অংশগুলি কপি করা, নোট করা, লেক্‌চার তৈরী করা ইত্যাদি ব্যাপারে কারোর সাহায্য নিতেন না।

৭৭ বছর বয়সে মহারাজ জাপানে গেলে জনৈক সন্ন্যাসী-সেবক মহারাজের ব্যবহৃত জামাকাপড় ধুয়ে দেবার জন্য প্রার্থনা জানালেও মহারাজ কিছুতেই রাজী হলেন না। শৌচাগার পরিষ্কার করা থেকে যে কোনও সাধারণ কাজই তিনি নিজের হাতে করে নেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন।

মহারাজ বারবার বুঝিয়েছেন, 'আধুনিকতা' মানে হল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মানবতা—এ দুটি গুণের সার্থক সমাহার। আর এজন্য তিনি বিদেশের মানুষের কাছেও হয়ে উঠেছেন এত গ্রহণযোগ্য। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী অনুসন্ধিৎসাকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেও একই সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন যে, গভীর মানবপ্রেমের দ্বারা জারিত না হলে ঐ দৃষ্টিভঙ্গী কোন স্থায়ী, স্থিতিশীল মানবসভ্যতা তৈরী করতে পারে না। অন্যদিকে ভারতবর্ষের মানুষকে তিনি নতুন করে শুনিয়েছেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমনস্কতার মহিমা এবং যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টি দিয়ে বেদান্ত অধ্যয়ন ও তাকে জীবনে প্রয়োগের দিগ্‌দর্শন। উপনিষদ্-গীতা-ভাগবতের ঐতিহ্যে ও শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজীর জীবনালোকে গড়ে তুলতে হবে যথার্থ উদার, সংস্কারমুক্ত, মানবমুখী এক ব্যক্তিত্ব—এই ছিল তাঁর বক্তব্যের বলিষ্ঠ আবেদন।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর অন্যতম বিশেষত্ব—তিনি কেবল ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংহতির কথাই বলেননি ; আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রণী কয়েকটি ক্ষেত্রে—যেমন, কণা পদার্থবিদ্যা, মহাকাশবিজ্ঞান, জিনেটিক্স ও স্নায়ুবিদ্যার গভীরে সাধনোচিত অভিনিবেশ সহকারে প্রবেশ করে তিনি ঐ সব বিজ্ঞানের সঙ্গে কয়েক হাজার বছর আগে উচ্চারিত বেদান্তদর্শন নিহিত সত্যের সাযুজ্য প্রদর্শন করেছেন অভ্রান্তভাবে ; কখনো বা প্রফেটিক প্রত্যয়ের সঙ্গে। আধুনিক মানুষের দুই মূল জিজ্ঞাসা—বিজ্ঞান ও ধর্মকে দুই হাতে নিয়ে চলার ক্ষেত্রে তিনি যে স্বামী বিবেকানন্দের একজন যথার্থ উত্তরসাধকের মর্যাদার আসন অর্জন করেছেন, তা-ই নয়, তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টিপ্রসূত মৌলিক বিশ্লেষণ বহুক্ষেত্রে উন্মোচন করে দিয়েছে ধর্ম-দর্শনের ভবিষ্য মেলবন্ধন তথা উত্তরোত্তর গবেষণার নব নব দিগন্ত।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আচার-আচরণের ওপর মহারাজ সবসময় খুব জোর দিতেন। বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিমাত্রেই লক্ষ্য করে থাকেন যে, সময়, দূরত্ব বা টাকার অঙ্কের উল্লেখ করবার সময় অনেকেই ৫, ১০ বা তাদের গুণিতকগুলির ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। যেমন, ৮টা ৪০ মিনিটকে পৌনে ৯টা বলে উল্লেখ করা বা ৩.৭ কিমিকে ৩$^{১}/_{২}$ কিমি বলা। ৯ লক্ষ ৬০ হাজারকে পৌনে ১০ লক্ষ টাকা বলা হয়, কিন্তু সঠিক অঙ্কটি প্রায়ই উল্লেখ করা হয় না। এই অঙ্কগুলির সঠিক উল্লেখ করার উপর মহারাজ জোর দিতেন। সাধু-ব্রহ্মচারীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা বৃদ্ধির জন্য তিনি মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের লাইব্রেরীতে এই সম্পর্কে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই—Introduction to Science—by Sir J. Arthur Thomson-এর অনেকগুলি কপি সাইক্লোস্টাইল করিয়ে উপহার দিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ জীব-বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স্-এর 'The Selfish Gene' গ্রন্থটি মহারাজ বহুবার পড়েছেন। গ্রন্থকার সেখানে দেখিয়েছেন যে, যেহেতু আমরা স্বার্থপর হয়েই জন্মেছি, তাই আমাদের স্বেচ্ছায় ত্যাগ স্বীকার এবং বদান্যতার শিক্ষা নেওয়া উচিত ; জন্মলব্ধ এই জিনঘটিত স্বার্থপরতা এবং কিছু স্বার্থপর মেম (Meme) সর্বস্ব বদ্ধমূল ধারণাকে সমূলে উৎপাটন করার ক্ষমতা আমাদের আছে।

পূজনীয় মহারাজের মতে মেম-এর উৎসানুসন্ধানে আমাদের মানুষের ব্যক্তিত্বের গভীরে প্রবেশ করতে হবে। এখানেই বেদান্তের শিক্ষা অপরিহার্য। দেহাত্মবুদ্ধি, অর্থাৎ 'আমার

দেহটিই আমি' এই বুদ্ধি দূরীভূত না হলে মানুষের জীবনে কোনরকম নৈতিক এবং মানসিক মূল্যবোধের বিকাশ সম্ভব নয়।

মহারাজ হাত দেখা বা হাত দেখান সম্পর্কে কখনোই কৌতূহলী ছিলেন না। তবু এ ব্যাপারে তাঁর জীবনের দু-তিনটি ঘটনার উল্লেখ করতেন। প্রথমটি হল, মহারাজ যখন ঘর ছেড়ে সাধু হবেন সেই সময়কার কথা। একদিন তাঁর মা একজন জ্যোতিষীকে এনে তাঁর হাত দেখান। জ্যোতিষী কয়েকটি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, জাতক সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করবে ও সুবিখ্যাত পণ্ডিত হিসাবে লোকসমাজে প্রসিদ্ধ হবে এবং চিরদিন মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদপুষ্ট থাকবে।

মহারাজ তখন করাচিতে। একদিন এক পরিচিত মুসলমান জ্যোতিষী ভক্ত মহারাজের হাতটি নিয়ে দেখতে থাকেন। একটু দেখেই তিনি আশ্চর্য হয়ে বলেন, "মহারাজ, আপনি কীভাবে সন্ন্যাসী হলেন? আপনার হাতে রয়েছে যে, আপনি নেপোলিয়ন ইত্যাদিদের মতো একজন জগদ্বিখ্যাত শাসক হবেন।" একথা শুনে মহারাজ একটু মৃদু হাসলেন।

আর একবার এরকমই ঘনিষ্ঠ একজন মহারাজের হাতটি নিয়ে গুনছিলেন। মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি সাধু না হলে জীবনে কী হতেন?" মহারাজ উত্তর দিলেন, "যে ভাবেই হোক্ দেশের সেবা করতাম।"

মহারাজের মধ্যে ছিল অসাধারণ মৌলিকত্ব। 'ধর্ম' শব্দটির বহুধা ব্যবহার অনেক সময়ে আমাদের বিমূঢ় করে। মহারাজ এ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলে তাঁর লেখালেখি, আলোচনা ও ভাষণে তিনি একটি নতুন শব্দ আবিষ্কার করে ব্যবহার করেছেন। সেটি হল 'Spiritual Science' বা 'আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান'। ধর্মের মূল কথা যে আধ্যাত্মিকতা, উপলব্ধি বা অনুভূতি, তার স্পষ্ট ব্যঞ্জনা এই শব্দটির মধ্যে স্বতঃই প্রকাশিত। ধর্মের গৌণ অঙ্গগুলি, যেগুলি নিয়ে সাধারণতঃ বাদবিতণ্ডা, গোলযোগ ও অশান্তি হয়—এই শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে তা পরিহার করা গেছে। অবশ্যই এটি মহারাজের একান্ত নিজস্ব অবদান।

এতদিন দীক্ষার আবেদনপত্রে স্ত্রী বা স্বামী একক ভাবে দীক্ষা নিতে চাইলে অথবা কুমারী মেয়ে একা দীক্ষা নিতে চাইলে খুব একটা প্রশ্রয় পেত না। কিন্তু মহারাজ আবেদন পত্রে ঐ ধরণের কঠোরতা তুলে দিলেন। সকলকে স্বাধীনতা দান মহারাজের একটি বিশেষত্ব।

যুব সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করতে এবং ভক্তদের নতুন ভারত গঠনে ভূমিকা নিতে সাহায্যকারী গ্রন্থ 'স্বামীজীর পত্রাবলী' ও 'ভারতে বিবেকানন্দ' দীক্ষার জন্য অবশ্যপাঠ্য পুস্তক রূপে সংযোজন করলেন।

ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ব্রহ্মচারীদের জন্য তাঁর বক্তৃতাগুলিতে তিনি বিচারহীন গতানুগতিকতার পথে চলতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন, "যদি ঐ পথ ধর (if you are in the queue) তাহলে ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস, অধ্যক্ষপদ প্রভৃতি সবই কালে লাভ করবে, কিন্তু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য জীবনে ফুটিয়ে না তুলতে পারলে জীবন সার্থক হবে না। স্বামীজী বলতেন, 'ঠাকুর মৌলিক ছিলেন, আমাদের সবাইকেই মৌলিক হতে হবে।' "

স্বামীজীর বার্তাবাহক রঙ্গনাথানন্দজীর সব উপদেশই স্বামীজীর বাণীর প্রবল প্রতিধ্বনি। স্বামীজীর এক একটি বাণীকে মহারাজ বোমার মতো মনে করতেন ; বলতেন— Vedantic

thought bomb'। স্বামীজীর বাণী ও রচনা তো তাঁর প্রাণের বস্তু ছিলই ; তার মধ্যে আবার Lectures from Colombo to Almora' (ভারতে বিবেকানন্দ) তাঁর প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। শোনা যায়, তিনি প্রায় একশ বার বইটি পড়েছিলেন। সাধু ও ভক্তদেরও তিনি ওটি পড়তে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। মহারাজের নিজের উক্তিগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল—

- তোমার কি আধ্যাত্মিক উন্নতি হচ্ছে? তুমি কি অন্যদের ভালবাসতে পার? অন্যদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতে পার? তোমার কি নিজের মধ্যে শান্তি আছে এবং সে শান্তি কি তুমি তোমার চারদিকে ছড়িয়ে দিতে পার? সেটাকেই বলে আধ্যাত্মিক উন্নতি—যা আসে অন্তর্জগতে ধ্যানতন্ময়তা ও বহির্জগতে সেবার মনোভাবে কাজ করার মধ্য দিয়ে।
- ঈশ্বর-অনুরাগকে রূপান্তরিত করতে হবে মানবপ্রেমে।
- শিক্ষিতদের পুনরায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে।
- মানুষ স্বরূপতঃ ঐশ্বরিক ভাবাপন্ন ও আধ্যাত্মিক ; কিন্তু সে-আধ্যাত্মিকতা রয়েছে সুপ্ত। আমাদের তাকে বিকশিত করতে হবে নিজের নিজের জীবন ও কর্মে ; গড়ে তুলতে হবে নৈতিক দৃঢ়তা ও ইচ্ছাশক্তি।

ছাত্র-ছাত্রী ও ভক্ত, বিশেষ করে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শিক্ষানবীশদের তিনি যে-শিক্ষা দিতেন, তার প্রধান কয়েকটি দিক হল ঃ

- ব্যক্তিগত জীবনে কখনো কোন গোপনীয়তা রাখবে না।
- লোক-দেখানো ভাব, পণ্ডিতি ও উন্নাসিকতা একেবারে বর্জন করবে।
- অর্থের বা সম্পদের পিছনে ছুটো না।
- সবসময় ইতিবাচক চিন্তা করবে।
- 'প্রত্যেকেই দেবস্বরূপ, এবং সকলের লক্ষ্য হল অন্তরের সেই দেবত্বকে প্রকাশ করা'—স্বামীজীর এই বাণী শিরোধার্য করে সব কাজ করবে।

মহারাজের শাসন ছিল ভালবাসার ও মৃদুতার। তাঁর শাসনের মূল লক্ষ্যই ছিল ভুল সম্পর্কে সচেতন করানো এবং চেতনার ঊর্ধ্বায়ণ ঘটানো।

একদিন মহারাজ প্রাতরাশ সারছেন। খাবারের মধ্যে একটা পদ ছিল পাকা কলার মণ্ড। কিছুটা খেয়েই মহারাজ সেবককে ডাকলেন। জিজ্ঞাসা করলেন ঐ ছরাটায় আর কলা আছে কিনা এবং থাকলে একটা আনতে। আনার পরেই মহারাজ সেবককে কলাটা ছুলে খেতে বললেন। একটু পরে মহারাজ জিজ্ঞেস করছেন, "তোমার গলাটা কি একটু জ্বালা জ্বালা করছে?" লজ্জায় অধোবদনে সেবক বলল, "হ্যাঁ, মহারাজ।" মহারাজ শুধু বললেন, "আমার গলাটাও খুব জ্বলেছে। আমাকে যখন কিছু খেতে দেবে, নিজে একটু খেয়ে দেখে নেবে। ঠিক উপযুক্ত পাকা না হলে দেবে না।" সেদিন মহারাজ আর কিছুই বলেননি। পরে সেবক বলেছে, "সত্যিই সেদিন কলাটা যথেষ্ট নরম ছিল না। অপারগ হয়েই দিয়ে ফেলেছিলাম। মহারাজের এত কষ্ট হয়েছে শুনে আমার মনে দারুণ আঘাত লাগে। কিন্তু মহারাজ আমায় বকেননি। সেদিন বকলে হয়ত ঘটনাটা আমায় এত কষ্ট দিত না, ভুলেই যেতাম। কিন্তু না বকে মহারাজ যে কী শিক্ষাই দিলেন—তা জীবনে হয়ত কোনদিনই

ভুলতে পারব না।" এই দুদিন আগে আবার ঘটনাটি বলে সেবক মহারাজ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

মহারাজ রয়েছেন হায়দ্রাবাদ মঠে। বিকেল বেলা। চিঠিপত্র পড়ছেন। একটি চিঠি পড়ে পূজারী ব্রহ্মচারীকে ডেকে পাঠালেন। সে কাছে এলে মহারাজ ধীর শান্তস্বরে বললেন, "বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট মহারাজ চিঠি লিখেছেন। কিছুদিন আগে একদল ভক্ত এখানে মন্দির দর্শনে আসেন। এখানকার পূজারী নাকি তাঁদের খুব বকাবকি করেছে এবং রূঢ় কথা শুনিয়েছে। সে পূজারী কি তুমি?"

ব্রহ্মচারী সেদিনের কথা ভুলেই গিয়েছিল। সভয়ে মহারাজকে সেদিন কি ঘটেছিল তা সংক্ষেপে বর্ণনা করল। বলল, "হ্যাঁ মহারাজ, সেদিন এ দোষ আমিই করেছিলাম। বিকেলে মন্দির খুলতেই তাঁরা এসেছিলেন। আর কোন ভক্ত ছিল না। খুব জোরে জোরে কথাবার্তা বলছিলেন। নাটমন্দির গমগম করছিল। আমি তাঁদের ওভাবে কথা বলতে বারণ করি। মন্দিরের গাম্ভীর্য ও শান্তভাব বজায় রাখতে অনুরোধ করি। তাঁরা আমার সঙ্গে তর্ক করতে শুরু করলেন। তখন আমি একটু জোরের সঙ্গেই কিছু বকাবকি করি। হয়ত রূঢ়কথাও বলে থাকব। আমার ভুল হয়েছিল মহারাজ।"

ব্রহ্মচারী কথা শেষ করলে পূজনীয় মহারাজ অনেক ফাইলের মধ্যে থেকে একটি ফাইল খুলে নিজের হাতে লেখা একটি কাগজ তার হাতে দিলেন। তাতে রয়েছে একটি কবিতা। মহারাজ কবিতাটি তাকে পড়তে বললেন। কবিতাটি হল ঃ

Speak Gently

David Bates

Speak gently; it is better far
To rule by love than fear
Speak gently; let no harsh words mar
The good we might do here.

Speak gently to the little child
Its love be sure to gain,
Teach it in accents soft and mild
It may not long remain.

Speak gently to the aged one,
Grieve not the careworn hear;
The sands of life are nearly run,
Let such in peace depart.

Speak gently, kindly to the poor;
Let no harsh tone be heard.
They have enough they must endure
Without an unkind word.

Speak gently to the erring; know
They must have toiled in vain;
Perchance unkindness made them so,
Oh, win them back again.

কবিতাটি পড়া শেষ হলে মহারাজ তাকে শোনালেন ছেলেবেলায় তাঁর মা বন্ধুকে একটি কটু কথা বলায় তাঁকে কিরকম ভর্ৎসনা করেছিলেন এবং স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, মা সরস্বতী আমাদের জিহ্বায় বাস করেন। তাই কখনোই কর্কশ কথা বলতে নেই। তাহলে তাঁকেই অবমাননা করা হয়। আর সেদিন থেকেই তিনি মায়ের কথাটি মন-প্রাণ দিয়ে পালন করার চেষ্টা করে চলেছেন। সে (ব্রহ্মচারী)-ও যেন সেই চেষ্টাই করে।

মহারাজ শেষের দিকে অনেকের কাছেই একটি কথা বলেছেন যে, তিনি আবার জন্মাতে চান ; হয়ত সেটি খুব শীঘ্রই। জন্মে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে ব্রহ্মচারী হয়ে যোগদান করে আবার সমগ্র জীবন ধরে ঠাকুর-মা ও স্বামীজীর কাজ করতে চান। বলেছেন, মানুষ হয়ে জন্মে তাঁদের জন্য crucification জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার ও দুর্লভ সুযোগ। সেটি যদি ঠাকুর অনন্ত বার দেন তাতে তিনি নিজেকে অনন্তবার সৌভাগ্যবান বলে মনে করবেন। ঠাকুর কী করবেন তিনিই জানেন। তবে, তিনি (মহারাজ) হাসিমুখে আসতে ও কাজ করতে রাজী।

অন্ত্যলীলাকালে ঠাকুর একদিন বলছেন, "যদি একটি মানুষেরও উপকার হয়, তার জন্য আমি হাজারবার জন্মাতে পারি।" শ্রীমাও স্বীকার করেছেন, "বারবার আসা...বারবার সেই শিব, সেই শক্তি। নিস্তার নেই।" স্বামীজীর নিঃশঙ্ক উক্তি, "যতদিন দেশের একটি কুকুর পর্যন্ত অভুক্ত থাকবে, ততদিন আমি নিজের মুক্তি চাই না।" শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তথাকথিত গুরুবাদের কোন প্রশ্রয় নেই। এখানে গুরুতত্ত্বের একটি বিশিষ্টতা রয়েছে যা শ্রীরামকৃষ্ণ হতে উদ্ভূত, শ্রীরামকৃষ্ণে স্থিত এবং শ্রীরামকৃষ্ণেই পর্যবসিত। মানুষ-গুরু প্রতিমা মাত্র, সচ্চিদানন্দ গুরুর (শ্রীরামকৃষ্ণের) প্রতীক মাত্র। এ-ই শ্রীরামকৃষ্ণ পরম্পরা, রামকৃষ্ণ ভাবগঙ্গা। এক একজন মানুষ-গুরু সেই ভাবগঙ্গারই এক একটি ঢেউ। ঢেউ-এর গঙ্গা নয়, গঙ্গারই ঢেউ। ঘটের জলে প্রতিফলিত সূর্য ঘট ভেঙ্গে গেলে বিলীন হয় কিন্তু আসল সূর্য আকাশেই থাকে। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী এ ভাবাদর্শের যূপকাষ্ঠে নিঃশেষে সমর্পিত একটি সার্থক প্রাণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবপ্রভায় উদ্ভাসিত অসংখ্য মানুষের হৃদয়াকাশে মহারাজ এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন।

॥ ওঁ ॥